দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

সুভাষকে ঘরে ফেরানো গেল না কেন?
— পৃঃ ১৫

নেতাজীর মৃত্যু রটনার উৎস সন্ধান
— পৃঃ ২৪

৭৭ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ২০ জানুয়ারি, ২০২৫।। ৬ মাঘ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ।।

৭৭ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ৬ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২০ জানুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

শুভেন্দু নিধনে অসমর্থ মমতার একাগ্নি বাণ এখন কেবল অভিষেক : হেরো মমতা গেরো মমতা

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ওরা বলছে, 'আরজি কর করে দেব!' ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রাজধানীর ভোটবিচিত্রা ◻ আর জগন্নাথন ◻ ৮

চীনের পালটা ভারতের সিয়াং নদীর বহুমুখী প্রকল্প

◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

নেতাজী জয়ন্তীতে ক্ষমা চাইতেন কমিউনিস্টরা, কংগ্রেসের বোধোদয় কবে হবে? ◻ ড. জয়ন্ত চৌধুরী ◻ ১১

নেতাজীর বিবাহ প্রচার এক বড়ো চক্রান্ত

◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ১৩

সুভাষকে ঘরে ফেরানো গেল না কেন?

◻ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ◻ ১৫

নেতাজীকে দেওয়া প্রবাসী ভারতীয়দের বিপুল অর্থ-সম্পদ গেল কোথায়? ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৭

ভাববার মতো কিছু কথা ◻ অমিত চৌধুরী ◻ ১৯

স্বামীজীর বজ্রবাণীতে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন নেতাজী

◻ অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী ◻ ২৩

নেজাতীর মৃত্যু রটনার উৎস সন্ধান ◻ ডাঃ মধুসূদন পাল ◻ ২৪

দেশ-বিদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারে অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ◻ কানু রঞ্জন দেবনাথ ◻ ৩১

চন্দ্রশেখর আজাদ : এক অনন্য সাধারণ বিপ্লবী

◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

জ্ঞাতজনের অজ্ঞাতবাস ◻ অম্লানকুসুম ঘোষ ◻ ৩৫

প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ যে বই ◻ গৌতম কুমার মণ্ডল ◻ ৩৮

ভারতের স্বাধীনতায় সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদান

◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৪৩

নেতাজী—কংগ্রেস—সাভারকর ◻ সায়ন্তন বসু ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ :

◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ খেলা : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২৭ জানুয়ারি
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৭ জানুয়ারি
২০২৫

ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র দিবসই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করলেও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে একটি দেশ মাত্র ছিল। ইংল্যান্ডের রাজাই তখন ভারতের রাজা। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত প্রকৃত স্বাধীন দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সাধারণতন্ত্র দিবস ভারতবাসীর কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন সুজিত রায়, দুর্গাপদ ঘোষ, দেবজিৎ সরকার, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, আনন্দমোহন দাস প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০ + ৩৬০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০ + ৮৫০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চিরভাস্বর নেতাজী

ভারতবর্ষকে এক সময় স্বর্ণপ্রসবিনী বলিয়া অভিহিত করা হইত। ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল এই দেশ। সেই সম্পদের লোভে বৈদেশিক লুঠেরারা বারংবার এই দেশ আক্রমণ করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তো শুধু স্বর্ণপ্রসবিনীই নয়, বীরপ্রসবিনীও । ভারতমাতার বীর সন্তানগণ মরণপণ লড়াই করিয়া সেই শত্রুদের বিতাড়িত করিয়াছে। কিন্তু এই দেশেরই কতিপয় কুলাঙ্গার ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রুর সঙ্গ দিয়াছে, স্বদেশে আহ্বান করিয়াছে। একদিকে এই ভূমির বীর সন্তানরা বীরবিক্রমে লড়াই করিয়াছে, অন্যদিকে এই বিশ্বাসঘাতকরা শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। ইতিহাসে অম্ভী, জয়চাঁদ, মানসিংহের নাম বিশ্বাসঘাতক রূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইংরাজ শাসনও বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারাই এই দেশে কায়েম হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিশ্বাসঘাতকদের সংখ্যা কম ছিল না। ভারতমাতার দামাল সন্তানেরা যখন মরণপণ লড়াই করিতেছেন তখন কত যে নরেন গোঁসাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বেদনার বিষয় হইল, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও এই দামাল সন্তানদের পথভ্রষ্ট, উগ্রবাদী, বখাটে বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। যে দামাল শিরোমণি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বুকে কাঁপন ধরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকেও ইহারা কটাক্ষ,অপমানিত, লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাঁহার চরিত্রে কালিমালেপন করিয়াছে। কিশোরকাল হইতেই সুভাষচন্দ্র নিখাদ দেশপ্রেমে জারিত, দেশজননী ও স্বীয় গর্ভধারিণীকে তিনি পৃথক করিতে পারিতেন না। দেশের তথাকথিত অহিংস নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে যোগ্য সম্মানটুকুও প্রদান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তিনিই একমাত্র নেতা যিনি দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহার বিকাশ সাধন কীরূপে হইবে তাহারও রূপরেখা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিখাদ দেশপ্রেমকে সহ্য করিতে না পারিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চ কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষু এড়াইয়া বিদেশে পাড়ি দিয়া আরও এক মহাবিপ্লবীর সান্নিধ্য ও সহযোগিতায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, যথারীতি স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সেই সময় বৈদেশিক মদতপুষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি তাঁহাকে তোজোর কুকুর, কুইসলিং প্রভৃতি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া অপমানিত করিয়াছে। আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন মণিপুর সীমান্তে প্রবেশ করিয়া স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করিতেছে, তখন একজন জাতীয় নেতা নেতাজীকে জাপানের দালাল বলিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিল্লিতে প্রবেশ করিলে তিনি স্বয়ং তরবারি হস্তে নেতাজীর মোকাবিলা করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন। জাতির দুর্ভাগ্য যে এহেন নেতাই দেশের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন। দেশ খণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশবাসী যখন নেতাজীর প্রশংসায় মুখর, তখন তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেই ভণ্ড নেতা এবং তাহার সহচরেরা নেতাজীর চরিত্র হননে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার বিবাহের কপোলকল্পিত গল্প ফাঁদিয়াছেন। অধিক বেদনার বিষয় হইল, নেতাজীর তথাকথিত স্ত্রী ও কন্যাকে স্বীকৃতি দিয়া তাঁহার পরিবার পরিজনও সেই চক্রান্তে শামিল হইয়াছে।

এহেন উপেক্ষা, অপমান, লাঞ্ছনা সত্ত্বেও ভারতবাসী কিন্তু নেতাজীকে মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়াছে। আপামর ভারতবাসীর বিশ্বাস যে নেতাজীর জন্যই দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসকরাও স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা গান্ধী-নেহরুর ভয়ে নহে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁহার আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভয়েই তড়িঘড়ি ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। ইতিহাসের এমনই গতি যে নেতাজীর চক্রান্তকারীদের দেশবাসী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, আজও সেই চক্রান্তকারীদের পাপকর্ম দেশ বহন করিয়া চলিতেছে। আজও দেশের প্রতিটি সেনানিবাসে নেতাজীর চিত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পায় নাই। আনন্দের বিষয় যে নেতাজীর প্রতি চক্রান্তকারীদের এই অপকর্ম বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার স্খালন করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তিনি নেতাজীকে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিই আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছেন। ভাগ্যের পরিহাস যে, যাহারা নেতাজীকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অপমান করিয়াছেন এবং যাহারা তাঁহার নামে কুৎসা রটনা করিয়াছিলেন, তাহারা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও এখনো কেহ কেহ তাঁহার অবমূল্যায়ন করিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের এক পণ্ডিতম্মন্য নেতা তাহাদের নেত্রীকে নেতাজীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন। ঈশ্বর ইহাদের ক্ষমা করুন! এই মহাপাপে ইহারাও অচিরেই ধ্বংস হইবে। কোনো কালিমা নেতাজীকে স্পর্শ করিতে পারিবে না,কারণ নেতাজী সূর্যের ন্যায় চিরভাস্বর।

সুভাষিতম্

কঃ কালঃ কানি মিত্রাণি কো দেশঃ কৌ ব্যয়াগমৌ।
কশ্চাহং কা চ মে শক্তিঃ ইতি চিন্ত্যং মুহুর্মুহুঃ।। (চাণক্যনীতি)

কীরকম পরিস্থিতি, কে আমার মিত্র, আমি কোন দেশের, আমার আয় অনুসারে ব্যয় কেমন, আমার কত শক্তি— এই বিষয়ে বারবার চিন্তা করা প্রয়োজন।

শুভেন্দু নিধনে অসমর্থ মমতার একাগ্নি বাণ এখন কেবল অভিষেক

হেরো মমতা গেরো মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কুরুসভায় দ্রৌপদীর প্রশ্ন ছিল, 'যিনি নিজেই হেরে বসে রয়েছেন, অন্যকে তিনি বাজি ধরেন কী করে?' পাশাখেলায় সব কিছু হারিয়ে যুধিষ্ঠির পত্নী দ্রৌপদীকে বাজি ধরেছিলেন। কেন ধরেছিলেন তার নানান ব্যাখ্যা আর যুক্তি রয়েছে। তবে অধিকার থাকলেই তার যথেচ্ছ প্রয়োগ করা যায় কিনা বা তা কতটা সমীচীন আর নৈতিক হয়? রাজ্য রাজনীতিতে দ্রৌপদীর ভূমিকায় এখন অভিষেক। আর মমতা যুধিষ্ঠির। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে প্রথম ডার্বি হেরেছেন মমতা অথচ অভিষেককে এখন পঙ্গু করে দিচ্ছেন। যুধিষ্ঠির দু'বার পাশা খেলেছিলেন। মমতা সেই সাহস দেখিয়ে বোকামি করবেন বলে মনে হয় না। ফিরতি ডার্বি খেলবেন না। প্রথম রাউন্ডে জিতে থাকা শুভেন্দুবাবু তাই আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছেন রাজ্যের যে কোনো কেন্দ্র থেকে তিনি মমতার বিরুদ্ধে লড়তে রাজি আর তার জয় অবশ্যম্ভাবী। অভিষেক তাই প্রশ্ন তুলতেই পারেন, 'দিদি (সম্পর্কে তাঁর পিসি হলেও মমতাকে অভিষেক দিদি বলেই ডাকেন), তুমি তো নিজেই হেরে গিয়েছ। তাহলে?'

অভিষেকের বিরুদ্ধে দলের ভিতরে বাইরে এক ঝুড়ি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। মমতাই তা সামলাচ্ছেন। নন্দীগ্রামে শুভেন্দুবাবুর কাছে হার মমতার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড়ো ধিক্কার। তাই মমতাকে অভিষেককে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে আইপ্যাকের প্যাঁকপ্যাঁকানি তাঁকে সহ্য করতেই হবে। অভিষেক ঘনিষ্ঠরা গোপনে নির্বাচন কমিশনের কাছে নাকি নতুন দল করার আদেবন জানিয়েছিলেন। তেমন এক কারিগরের হাত থেকে অভিষেকের সমস্ত আইনি কাগজ কেড়ে নিয়ে একটি পেশাদার সংস্থাকে দিয়েছেন মমতা। যা রটে তা কিছু তো বটে। অভিষেক বনাম মমতার লড়াইয়ের চিত্রনাট্য মমতা নিজেই আঁকছেন। প্রকাশ্যে অভিষেকের ডানা ছাঁটছেন।

অর্ধশতকের রাজনৈতিক জীবনে মমতা দু'বার হেরেছেন। ১৯৮৯-এ সিপিএমের মালিনী ভট্টাচার্য আর ২০২১-এ শুভেন্দুবাবুর কাছে। শুভেন্দুবাবু (সাম্প্রতিক অতীতে) বা অভিষেক কখনও নির্বাচন হারেননি। যদিও তা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। একটি অন্তঃসারশূন্য মামলা করে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুবাবুর জয়কে বিতর্কিত করে রেখেছেন মমতা।

১৮ জানুয়ারি আরজি কর কাণ্ডে অভয়া নির্যাতন ও হত্যা মামলায় আদালতের রায়দানের তারিখ। এই রায় মমতার কাছে বড়ো পরীক্ষা। রাজ্যপাটে বারবার সিবিআই-এর উপর আস্থা রেখে এটা বলা হয়েছে যে, দোষীরা সকলেই শাস্তি পাবেন। কোনো আজগুবি রাজনৈতিক তত্ত্ব কাজ করবে না। আর তাই প্রায় অন্তরালে চলে যাওয়া বৃদ্ধ দলীয় সভাপতি সুব্রত বক্সীকে সামনে আনা হয়েছে। এতদিন তিনি নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন ছিলেন। মমতার পঞ্চতন্ত্রের একজন সুব্রতবাবু। মমতা বনাম বিজেপির রাজনৈতিক লড়াইয়ে এই মুহূর্তে মমতা অভিষেককে সযত্নে তাঁর তূণীরে তুলে রেখেছেন আর ফিরহাদ হাকিম, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর বা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরিদের ব্যবহার করছেন। বাংলাদেশে হিন্দু নিধন যজ্ঞের পালটা চাল হিসেবেই এই মুসলমান নেতাদের ব্যবহার করছেন মমতা যাতে ভোটবাক্সে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ঐক্যের মোকাবিলা করা যায়।

> **“মমতার রাজনৈতিক জীবনের শেষ ধাপের যন্ত্রণা অভিষেক আর হিন্দু ঐক্য। এই মুহূর্তে তাঁর সবচেয়ে বড়ো লজ্জা অভয়া কাণ্ড।”**

শুভেন্দুবাবুর জয়ের ভূত মমতাকে এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাতে গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছে তৃণমূলের বৃদ্ধকুল আর অভিষেক। মমতার এখন ছুঁচো গেলার অবস্থা। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটের সময় যত এগোবে নন্দীগ্রামের হেরো ভূত মমতাকে তত বেশি করে তাড়া করবে। নজর ঘোরাতে মমতা বৃদ্ধকুল, মুসলমান নেতা, বিএসএফের দুর্বলতা সামনে আনবেন।

মমতার রাজনৈতিক জীবনের শেষ ধাপের যন্ত্রণা অভিষেক আর হিন্দু ঐক্য। এই মুহূর্তে তাঁর সবচেয়ে বড়ো লজ্জা অভয়া কাণ্ড। মমতার রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হলে অভয়া অধ্যায়টিতে থাকবে কালো পাতা। ওই ঘটনাকে সাক্ষী রেখে পশ্চিমবঙ্গে কেউ 'মমতা' নামটা হয়তো আর রাখবেন না। ২০২১-এর পরীক্ষায় মমতা ফেল করার পর কম্পার্টমেন্টালে পাশ করেছিলেন। তাই ২০২৬-এ হয়তো মমতার প্রক্সি হবেন অভিষেক। আর অর্জুনরূপী শুভেন্দু অধিকারীকে বধ করতে সেই একাগ্নি অভিষেককে তাঁকে সযত্নে রাখতেই হবে। তবে মমতা জানেন না ঘটোৎকচ কীভাবে উদয় হয়ে সেই একাগ্নি খরচ করে দেবে। কারণ তিনি তো নিজেই হেরে বসে রয়েছেন। তিনি বাজি ধরবেন কী করে? □

ওরা বলছে, 'আর জি কর করে দেব!'

দিদিরূপেষু দিদি,

অনেক দিন পরে আবার তাপসদাদাকে মনে পড়ে গেল। সেই যে কৃষ্ণনগরের সাংসদ ছিল দিদি। সিনেমা খ্যাত তাপস পাল বলেছিল না, 'ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেব!' আবার সেই রকমই 'ডায়লগ' শোনা যাচ্ছে দিদি আপনার ভাইদের মুখে। আমার মতো ভাই অবশ্য ওসব বলে না। আমি হচ্ছি ভদ্র ভাই।

আর জি কর ধর্ষণ, হত্যা কাণ্ড মোটেও আর একটা বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। অপরাধের একটা ধারা হয়ে উঠেছে। দিন কয়েক আগে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এক মহিলা-চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন, হাসপাতালের সুপার তাঁকে হুমকি দিয়েছেন, 'আর জি কর করে দেব।' সুপার অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু দিদি, এটা নতুন নয়। গত ৯ আগস্টের সেই আর জি করের ঘটনার পরে এমন হুমকি এই প্রথম নয়। গত অক্টোবরে আর জি কর হাসপাতালের এক মহিলা চিকিৎসক, সেপ্টেম্বরে মালদহের চাঁচলে সরকারি হাসপাতালে এক কর্তব্যরত নার্স একই হুমকি শুনেছেন। কখনো রোগীর কাছ থেকে। কখনো আপনার কোনো ভাইয়ের থেকে। হাসপাতালের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র 'আর জি কর' হয়ে ওঠার উপক্রম হচ্ছে গো দিদি। এটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, 'আর জি কর' এ রাজ্যে হুমকির একটি নতুন লব্জ তৈরি করে ফেলেছে।

সমাজে যে সব মেয়ে 'অবাধ্য' হিসেবে চিহ্নিত হবে তাঁদের কি এবার থেকে এমন হুমকি শুনতে হবে? ভয় করে দিদি। মেয়েদের কত দূর ক্ষতি করা যায়, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এখন 'আর জি কর করে দেব' বলাই যথেষ্ট। এক অন্ধকার সেমিনার রুমে ক্ষতবিক্ষত এক দেহ এবং সেই বীভৎস কাজের রূপকারদের প্রতি প্রশাসনের প্রশ্রয়ের মনোভাব এমন পরিস্থিতি তৈরি করেনি তো দিদি? প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার অনুমতি রাজ্য সরকার কেন দিল না কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে? হুমকি সংস্কৃতিতে অভিযুক্ত ছাত্র ও ডাক্তারদের আর জি কর হাসপাতাল থেকে সাসপেন্ড করার বিরোধিতা করলেন আপনি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। অভীক দে ও বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, শাসক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত যে দুই চিকিৎসক আর জি কর কাণ্ডে জড়িত সন্দেহে এবং নানা দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার জন্য রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলেন, তাঁরাও ফিরেছেন কাউন্সিলে। এমন প্রতিটি সিদ্ধান্তই হাসপাতালে ডিউটিরত মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-হত্যার অভূতপূর্ব, জঘন্যতম অপরাধকে কি লঘু করে তোলেনি? অপরাধীর গ্রেপ্তার ও শাস্তির প্রত্যাশাকে ক্ষমতার খেলায় হার-জিতে পর্যবসিত করেছে শাসক দল। এটা আমি বলছি না দিদি, সকলেই বলছে। মানুষ ধরেই নিয়েছে, অভয়ার বিচার মিলবে না, প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়বে না। এই হতাশা যত ছড়িয়ে পড়েছে, ততই এমন ধারণা পোক্ত হচ্ছে যে, শাসকের প্রশ্রয় পেলে দোষীদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা নেই পুলিশ-প্রশাসনের। যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ না করলে বিচারব্যবস্থাও কিছুই করতে পারে না। কিন্তু তাতে যা ঘটেছে বা যা ঘটছে তা কখনো মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। এমন হুমকি আর বিচার না পাওয়ার হতাশা যত ছড়াবে, তত বাড়বে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি প্রতিকারহীন হিংসা। সেই সব ঘটনা আরও সহজ করবে কর্মরত মেয়েদের উপর অসম, অন্যায় শর্তের আরোপ, লিঙ্গের ভিত্তিতে নানা ধরনের বঞ্চনা, বৈষম্য ও অসম্মান।

আপনি মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও। চিকিৎসকদের বদলি, পদোন্নতি থেকে শুরু করে ছাত্রদের পরীক্ষার নম্বরে কারচুপি, স্নাতকোত্তর ছাত্র-চিকিৎসকদের বা ইন্টার্নদের নিয়োগ, এসব কিছুর পিছনে একটি দুর্নীতি চক্র কাজ করছে। এসব কি অস্বীকার করা যাবে দিদি?

আর জি কর কাণ্ডের পর কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়েছে যে মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্বাস্থ্য ভবনের সব স্তরে দীর্ঘদিন ধরে ছড়িয়েছে দুর্নীতির বিষ। আপনি মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও। চিকিৎসকদের বদলি, পদোন্নতি থেকে শুরু করে ছাত্রদের পরীক্ষার নম্বরে কারচুপি, স্নাতকোত্তর ছাত্র-চিকিৎসকদের বা ইন্টার্নদের নিয়োগ, এসব কিছুর পিছনে একটি দুর্নীতি চক্র কাজ করছে। এসব কি আর অস্বীকার করা যাবে দিদি? রাজ্যের সব পাচার ও প্রতারণার চক্র এভাবেই কাজ করে। রাজ্যের সব কর্মক্ষেত্রকে 'আর জি কর' করার শক্তিই আজ ক্ষমতার পরিচয়।

আর জি কর কাণ্ড এক অবাক করা প্রতিবাদ দেখিয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি জনতা আবার বলতে শুরু করবে না তো যে, 'আর জি কর করে দেব।' □

অতিথি কলম

আর জগন্নাথন

রাজধানীর ভোটবিচিত্রা

২০২৫-এর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে একটি বহুস্তরীয় রাজনৈতিক লড়াই। জাতীয় ইস্যু ছাড়াও দিল্লি শহর ও দিল্লি পুরসভাকেন্দ্রিক নানা ইস্যু দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। কোন দল দিল্লিতে কতগুলি আসন পাবে তা নির্ধারণ করে এই ইস্যুগুলি।

গত ৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার, দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের দৌড়ের বাঁশিতে ফুঁ দিল ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। এরপরেই শুরু হয়ে গেল নির্বাচনী দৌড়। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে হবে ভোটগ্রহণ। ফলাফল প্রকাশ আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। বলাবাহুল্য যে, তিন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী— আম আদমি পার্টি (আপ), ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং কংগ্রেসের জন্য এটি হতে চলেছে আরেকটি জোরদার রাজনৈতিক লড়াই। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, দিল্লির বুকে আসন্ন এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আম আদমি পার্টির ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, বিজেপির জন্য অপেক্ষাকৃত কম এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। ঝুঁকিপূর্ণ এই রাজনৈতিক লড়াইতে আপের কেবল জয় নয়, দিল্লি বিধানসভায় ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের অর্থ কেজরিওয়ালের মর্যাদাহানি। কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি কোনোমতে, কষ্টেসৃষ্টে জয় পেলে তা হয়ে উঠতে পারে বিজেপির আনন্দের কারণ। উঁচুমাত্রার এই রাজনৈতিক লড়াইতে অবতীর্ণ হয়ে কংগ্রেস দিল্লির কোথায়, কত ভোট পাবে— সেই বিষয়টিও হয়ে উঠতে পারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এই নির্বাচনে পরাজয় আম আদমি পার্টির পক্ষে হয়ে উঠবে অসহনীয়। রাজনৈতিক দলটির কাছে এই পরাজয় যেন একটি অশনি সংকেত। পরাজয়ের ভাবনা তাদের কাছে অসম্ভব ও অবাস্তব। স্বল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এই নির্বাচন আম আদমি পার্টির সর্বোচ্চ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক ভাবমূর্তির নির্ধারক হতে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১৫ সালে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বড়ো জয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্তরের রাজনীতিবিদ হিসেবে কেজরিওয়ালের উত্থান ঘটে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলেও দিল্লিতে রয়েছে স্থানীয় সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর শাসন। দিল্লিতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ উচ্চ হওয়ার কারণে দিল্লির সরকারের কোষাগার রীতিমতো সমৃদ্ধ। এই রাজস্ব সংগ্রহ ও কোষাগারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকার দরুন কেজরিওয়ালের পক্ষে তার দলকে অন্য রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়। আম আদমি পার্টির রাজনৈতিক গতিবিধি অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই কারণে, ‘দিল্লি’ সবসময়ই কেজরিওয়াল এবং আম আদমি পার্টির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরাজয়, খারাপ ফল বা ভোটে দুর্বল পারফরম্যান্স কেজরিওয়ালের ভাবমূর্তিকে ম্লান করার পক্ষে যথেষ্ট। কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক আকর্ষণ হ্রাস পেলে তখন বিজেপি-বিরোধী অন্যান্য দলগুলির বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টিকে ভোটারদের চোখে গ্রহণযোগ্যতা লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। সেক্ষেত্রে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে একসারিতে চলে আসবে আম আদমি পার্টি। তখন প্রধান বিরোধী দলের তকমা অর্জনের লক্ষ্যে, বিজেপির বিকল্প দল হিসেবে উঠে আসার উদ্দেশ্যে শুরু করতে হবে তাদের নতুন লড়াই।

কেজরিওয়ালের সামনে দিল্লি এনে দিয়েছে একটি বড়ো রাজনৈতিক সুযোগ। কেজরিওয়ালের পক্ষে এটি একটি বিশাল সুবিধা, কারণ দিল্লি কেবলমাত্র একটি বিধানসভাযুক্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নয়, গোটা দেশের রাজধানী। জাতীয় রাজধানী হওয়ার কারণে ভারত জুড়ে দিল্লির পরিচিতি। তাই দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেজরিওয়াল নিজেই আসন্ন নির্বাচনকে তার পক্ষেই যেন কিছুটা জটিল করে তুলেছেন। গত বছর তিনি পদত্যাগ করেন। দুর্নীতির অভিযোগে জেরবার কেজরিওয়াল বলেন যে, এই বিষয়ে তিনি ভোটারদের থেকে ক্লিনচিট চান। জনাদেশ পেয়ে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রত্যাবর্তন করবেন।

টানা দশবছর ক্ষমতায় থাকার দরুন এবার কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব। কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক ঔজ্জ্বল্য কিছুটা ম্লান হতে শুরু করেছে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ঢেউয়ে সওয়ার হয়ে ক্ষমতায় আসা ব্যক্তি নিজেই হয়ে উঠেছেন দুর্নীতিগ্রস্ত। মদ কেলেঙ্কারির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কয়েক মাস জেল খেটেছেন। দায়ী করেছেন বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতিকে। নিজেকে সৎ ইত্যাদি নানাকিছু বলে তিনি দাবি করলেও, তার ভাবমূর্তিতে কিছুটা কাদা হয়তো এখনও লেগে রয়েছে।

দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে হয় তার উত্থান। সেদিনের সেই রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগ হয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের

প্রতিশ্রুতি। এই সব ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ এবং সেই কাজে সাফল্যের দাবির সঙ্গে ভোটভিক্ষার লক্ষ্যে এইবারে নতুন সংযোজন একাধিক দান-খয়রাতি প্রকল্প। এই খয়রাতি নির্ভরতার বিপ্রতীপে স্থানীয় নাগরিকদের জল সরবরাহে ঘাটতি, বায়ুদূষণ উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার মতো প্রশাসনিক ব্যর্থতা আম আদমি পার্টির চরিত্রের নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরতে শুরু করেছে।

নানা রাজনৈতিক কারণে বিজেপির ধারণা যে, এবার তাদের সামনে একটি সুযোগ রয়েছে। অতীতের নির্বাচনগুলিতে ভোট প্রাপ্তির ধারা তাদের হয়তো কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। তাদের এই ভাবনাচিন্তার মূলে রয়েছে ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত দিল্লির ভোট পরিসংখ্যান। এই সময়ের মধ্যে আম আদমি পার্টির ভোটের হার সামান্য কমেছে। বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের অঙ্কে বড়ো ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও

৭০-সদস্য বিশিষ্ট দিল্লি বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা খুব বেশি বাড়েনি। ২০২০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টি পায় ৫৩.৬ শতাংশ ভোট। বিজেপি পায় ৩৮.৫ শতাংশ ভোট। বিজেপির পক্ষে ছিল ৬ শতাংশ স্যুইং। বিজেপির এই ভোটবৃদ্ধির মূল কারণ ছিল কংগ্রেসের ভোট হ্রাস।

২০২২ সালের দিল্লি পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের হার আরও বৃদ্ধি পায়। এই নির্বাচনে আম আদমি পার্টি পায় ৪২ শতাংশ ভোট। বিজেপি পায় ৩৯ শতাংশ ভোট। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান কমে দাঁড়ায় তিন শতাংশে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আপ-কংগ্রেসের যুগলবন্দি। সেই জোটকে পরাজিত করে দিল্লির সাতটি আসনের সবকটিতেই মসৃণ জয় পায় বিজেপি।

লোকসভা নির্বাচনের পর ভেঙে যায় আপ-কংগ্রেসের জোট। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আপ-কংগ্রেসের মধ্যে কোনো জোট নেই। গাঁটছড়া ভেঙে যাওয়ার কারণে কংগ্রেসের ফলাফল এই বিধানসভা নির্বাচনের পরিণামকে প্রভাবিত করবে। ২০২০ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পায় চার শতাংশের সামান্য বেশি ভোট। সেই ভোটের পরিমাণ বাড়িয়ে তারা এবার রাজনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের আশা করছে। কংগ্রেস এবার আর ঘুমিয়ে থাকছে না। বিভিন্ন লক্ষণে তা বেশ স্পষ্ট। আপ-সরকারের প্রশাসনিক অপদার্থতা থেকে শুরু করে দুর্নীতি পর্যন্ত নানা বিষয়ে তারা হয়ে উঠেছে সরব। প্রতিটি বিষয়ে আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেস হয়ে উঠেছে আক্রমণাত্মক।

আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস একই সংখ্যালঘু ও দলিত ভোট ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত। দু'দলেরই পাখির চোখ এই দুই সম্প্রদায়ের ভোট। তাই স্বাভাবিকভাবেই একটি দলের প্রাপ্ত ভোটের হার বৃদ্ধি অন্য দলটির রাজনৈতিক ক্ষতির কারণ। এক্ষেত্রে বিজেপি যদি কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধির আশা করে, বা কংগ্রেসের ভোট বেড়ে ১০-১২ শতাংশে পৌঁছে যায় এবং আম আদমি পার্টি প্রাপ্ত ভোট যদি সমপরিমাণ হ্রাস পায়, তাহলে বিজেপি হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনেও সক্ষম হতে পারে। মোট আসনের অর্ধেকের সামান্য বেশি আসন পেলেও চিন্তায় থাকবে আপ। কারণ নবনির্বাচিত কয়েকজন বিধায়ক কোনোভাবে দল বদল করলে দিল্লির ক্ষমতাকেন্দ্রে হয়ে যেতে পারে পট পরিবর্তন। সেক্ষেত্রে ১৯৯৮-এর পর দিল্লির ফের ক্ষমতাসীন হতে পারে বিজেপি। সেই যাত্রায় দিল্লিতে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন শীলা দীক্ষিত। এই নির্বাচনে কংগ্রেস শীলা দীক্ষিতের ভাবমূর্তির ওপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করছে। শীলা-পুত্র সন্দীপ দীক্ষিতকে নয়াদিল্লি আসনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে প্রার্থীও করেছে কংগ্রেস।

সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, দিল্লি বিধানসভায় নির্বাচনে আপের কোনো ভাবেই হেরে যাওয়া চলবে না। জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব ধরে রাখতে হলে এই ভোটে তাদের বিপুল জয় আবশ্যক।

নির্বাচনে পরাজয় ঘটলে তা বিজেপির পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় হবে না। কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরেই দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে। কয়েকদিন আগেই হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে জয়লাভ করেছে বিজেপি। এই জয়ের আবহে দিল্লিতে তাদের ভোট ধরে রাখতে না পারলে তা বিজেপির পক্ষে হবে একটি বিরাট ধাক্কা। বিগত নির্বাচনগুলিতে প্রাপ্ত ভোট ধরে রাখাটা তাদের কাছে এখন প্রধান পরীক্ষা।

ভোট প্রাপ্তির হারে কোনো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটলে কংগ্রেসের কাছে তা হবে একটি বড়ো পাওনা। ভোট বাড়লে কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাভ। সেই ভোট বৃদ্ধি আসন সংখ্যায় প্রতিফলিত না হলেও কংগ্রেস হয়তো ধারণা করবে যে, এই ভোট বৃদ্ধি ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতায় ফেরার পথ প্রশস্ত করতে পারে। আম আদমি পার্টির ভোট কমে যাওয়ার অর্থ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক ক্ষতি। সেই ক্ষতির বিনিময়ে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট বৃদ্ধি— আসন সংখ্যার বিচারে তাদের কোনো উত্থান হয়তো নয়, কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে নানা ধারণা জন্মে সহায়ক।

২০২৫-এর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে একটি বহুস্তরীয় রাজনৈতিক লড়াই। জাতীয় ইস্যু ছাড়াও দিল্লি শহর ও দিল্লি পুরসভাকেন্দ্রিক নানা ইস্যু দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলে। কোন দল দিল্লিতে কতগুলি আসন পাবে তা নির্ধারণ করে এই ইস্যুগুলি। অতীতের ভোটদানের ধরন, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতি বা দান-খয়রাতির প্রলোভনের বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে কিন্তু ভোটদাতারা সম্প্রতি ভোট দিচ্ছেন না। এখনও পর্যন্ত এই লড়াইয়ের ময়দান সবক'টি দলের কাছেই উন্মুক্ত। সম্ভাবনা সকলেরই রয়েছে। যুযুধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর বাইরে তিন নম্বর খেলোয়াড়ের ফলাফল ভোটের চূড়ান্ত পরিণামের ওপর বিষম প্রভাব ফেলতে চলেছে।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশক)

শোক সংবাদ

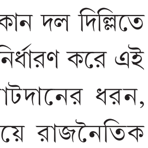

দক্ষিণ বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া খণ্ডের সহ খণ্ডকার্যবাহ আশুতোষ সাহার মাতৃদেবী নিভারানি দেবী গত ৩০ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

চীনের পালটা ভারতের সিয়াং নদীর বহুমুখী প্রকল্প

চীন সম্প্রতি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণের জন্য ১৩৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই বাঁধ হিমালয়ের এমন এক গভীর গিরিখাতে নির্মাণ করা হবে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ বিশাল বাঁক নিয়ে ভারতের অরুণাচল রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তারপর সেটি বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থা বিবিসি প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত জলবিদ্যুৎ কোম্পানি পাওয়ার কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন অব চায়নার দেওয়া হিসাব মোতাবেক, এই বাঁধ থেকে প্রতি বছর ৩০ হাজার কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।

বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধটি হলো চীনের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত থ্রি গর্জেস ড্যাম। এখান থেকে বছরে ৮৮.২ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। নতুন এই বাঁধের উৎপাদন ক্ষমতা থ্রি গর্জেস ড্যামের চেয়ে তিনগুণের বেশি। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, চীনের এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্প ভারত ও বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই কারণে দিল্লির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাও এই বাঁধ নির্মাণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রকল্পটি স্থানীয় বাস্তুতন্ত্র ও নদীর নিম্নধারে জলের প্রবাহ ও পথ পরিবর্তন করতে পারে বলে নিজেদের শঙ্কার কথা জানিয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ।

যদিও চীনা কর্মকর্তাদের দাবি, তিব্বতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পরিবেশ বা নদীর নিম্নপ্রবাহে জল সরবরাহের ওপর বড়ো কোনো প্রভাব ফেলবে না। এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ভারতের অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের নিংট্রি (নিয়ংচি) প্রাদেশিক এলাকার মেদোগ (চীনা ভাষায় মোতুও) বিভাগে নির্মিত হবে। এই বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও লাদাখের কিছু এলাকা নিয়ে হোটন প্রদেশে চীন দুটি নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল বা কাউন্টি গড়ে তুলেছে বলে সম্প্রতি ঘোষণাও করেছে শি জিনপিং সরকার।

কূটনীতকরা মনে করছেন, যদি চীন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বাঁধ তৈরি করতে সফল হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বে ভারতের ক্ষমতা, প্রশাসনিক না হলেও অন্তত জনমানসের ক্ষমতা অনেকটাই চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির মাথাব্যথা তো অবশ্যই।

ভারত অবশ্য শুধু মুখে অসন্তোষ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকছে না। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে ভারত পালটা চাল দিতে হাতিয়ার করতে চলেছে সিয়াং নদীকে। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্ব দিয়ে বয়ে যাওয়া সিয়াং নদী শীতকালে খুব শান্ত দেখায়। তবে বর্ষাকালে এই নদী কার্যত বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে। বাড়তি জলে ফুলেফেঁপে ওঠে এবং তার জেরে আশেপাশের জায়গায় বন্যার সৃষ্টি করে। এহেন অবস্থায় ভারত সরকারের তরফে এমন একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার জেরে সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘব হবে, আবার ঠিক তেমনি চীনকে ভালো রকমের জবাবও দেওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যদি চীন ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বাঁধ তৈরি করতে সফল হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বে ভারতের ক্ষমতা, প্রশাসনিক না হলেও অন্তত জনমানসের ক্ষমতা অনেকটাই চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। যা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির মাথাব্যথা তো অবশ্যই।

ঘটনা হলো, ভারত সরকার এবার সিয়াং নদীর উপর নির্মিত উচ্চ বহুমুখী প্রকল্প (অপার মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট) নিয়ে ময়দানে নামতে চলেছে। সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর যে বন্যা হয় তা কেবল নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করছে না, বরং একটা 'ব্যাকআপ' তৈরি করতে চাইছে।

এই নদীর জল সেচের কাজ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও ব্যবহার করতে চায় ভারত। এছাড়াও চীন যদি কোনোভাবে ব্রহ্মপুত্রের জল বন্ধ করে দেয়, তাহলে সিয়াং নদীর জল দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর চেষ্টা করতে পারে ভারত। মাল্টিপারপাস প্রজেক্টের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ভারতে শতদ্রু নদীর উপর অনেক বাঁধ রয়েছে, যেমন ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ, দামোদর ভ্যালি প্রকল্প। ভারত সরকারের এহেন পরিকল্পনার একটাই উদ্দেশ্য, দেশে চীনের প্রভাব যেনতেন প্রকারে কমানো। ব্রহ্মপুত্রনদ উত্তর-পূর্বের জীবনরেখা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করছে চীন। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চীনের এই পদক্ষেপ সময়মতো আঁচ করতে পেরেছেন। সেই কারণেই এই বিষয়ে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। □

নেতাজী জয়ন্তীতে ক্ষমা চাইতেন কমিউনিস্টরা, কংগ্রেসের বোধোদয় কবে হবে?

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

সেদিন তারা তাঁকে একঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাঁর কাজে তাদের পরাজয়ের গ্লানিকে চক্রান্তের জালে আড়াল করে বলতে হয়েছিল সুভাষবাবু অন্তত দেশের শত্রু নন।

যারা তাঁকে জাতীয় কংগ্রেস থেকে অপসারিত করতে ঐকমত্যে পৌঁছে গিয়েছিল, তারাও সুভাষচন্দ্রের কাজের শত্রু ছিলেন না। তবে ব্রিটিশের এক নম্বর চিহ্নিত শত্রু ছিলেন একমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুই। কারণ জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন আপোশকামী নেতাদের অনেকেই ব্রিটিশ সখ্যে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেই মাসোহারা, সাম্মানিক বেতন, কেউ-বা গভীর, গোপন, নিবিড় উষ্ণতার সম্পর্কে ও সান্নিধ্যে দেশের স্বার্থকে শুধু নয়, আপন দল ও পরিবারের প্রতিও উপেক্ষা করেছেন।

বিজ্ঞান বলে তেলে জলে মেশে না। সেই সুযোগ ইংরেজ শাসক কৌশলে কাজে লাগিয়েছিল বার বার। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের দেশভাগের মধ্যরাতে খুব সহজেই তাদের বাপুজীকে ব্রাত্য করেছিলেন তারা, হয়েছিলেন খণ্ডিত ভারতের রাজা-মন্ত্রীর দল। ইতিহাস সাক্ষী, কলকাতায় বসে প্রায় নিঃসঙ্গ গান্ধীজী তাঁর পুত্রতুল্য সুভাষের জন্য কেঁদেছিলেন। এরপর আমৃত্যু একাধিকবার বলেছেন তাঁর সুভাষের মৃত্যু হয়নি। এমনকী কোনো মৃতদেহ এনে সুভাষের বললেও তিনি বিশ্বাস করবেন না।

সেদিন গান্ধীজীর অন্তরাত্মা জানিয়েছিল সুভাষের মৃত্যু হতে পারে না। কয়েক বছর আগে যদি এমনটা হতো তাহলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর ক্ষমতাপিপাসু সহকর্মীরা সুভাষবধ পর্বে মেতে উঠত না। তবু সেই সুভাষই জনরোষকে শান্ত করে নিরাপদে গোবিন্দবল্লভ পন্থ, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্র প্রসাদদের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সুভাষ-চরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে ছিল অসাধ্য।

দুঃখের রাতের রাজপুত্র তিনি। তাইতো স্বেচ্ছায় আইসিএসের মতো ক্ষমতা-বৈভব ত্যাগ করে, আর এক রাজসন্ন্যাসী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ব্রতকে আপন করলেন। বার বার দুঃসহ কারাবরণ, অনশন, রাজপথে রক্তাক্ত হওয়া--- কোনো কিছুতেই তাঁকে আপোশকামিতার পথে প্রলুব্ধ করেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়--- দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র সার্থকভাবেই বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম গড়ে করে তুলেছিলেন উত্তরণের সোপান।

> **“বর্তমানের সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কা বঢরার কংগ্রেস কি পারবে তাদের পূর্বসূরীদের পাপমোচনের জন্য নেতাজী এবং আজাদ হিন্দের বঞ্চিত, বিস্মৃত সেনানীদের প্রতি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে?”**

‘ভারতছাড়ো’ আবহে যখন মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বহু মানুষ তাঁদের বুকের তাজা রক্তে মাতৃভূমিকে সিক্ত করছেন, সেই অবসরে রাজপ্রাসাদে ‘কারারুদ্ধ’ নেতাদের কেউ কেউ ‘ভারত আবিষ্কার’ -এর মতো বইপত্র রচনা করেছেন। জীবন বাজি রেখে দু’বারের নির্বাচিত জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে নিরুদ্দেশের পথিক হয়ে দেশান্তরি হতে হয়েছে। স্বাধীনতার সন্ধানে শুধুমাত্র তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের স্বার্থমগ্ন, জড়ত্বময় চেতনার জন্য। এগারোবার কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্রের যন্ত্রণার ভুক্তভোগী সেদিনের জাতীয় নেতাদেরকে হতে হয়নি। এগারোটি দেশের এবং রাষ্ট্রনায়কদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ সরকারের আগে ‘অস্থায়ী’ শব্দটি সুভাষচন্দ্র বসিয়েছিলেন সচেতনভাবেই। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনেতাদের সভায় প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে গান্ধী, নেহরু, আজাদদের মতো নেতারা রয়েছেন এবং ভারতবাসীর অধিকার আগে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা। তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা নেতাদের তিনি অবজ্ঞা করেননি। তাই আইএনএ-তে গান্ধী, নেহরু, আজাদের নামে সেনা ব্রিগেড ছিল। রণাঙ্গন থেকে ‘বাপুজী’ সম্বোধন করে গান্ধীর আশীর্বাদ লাভ করেছেন একদা গান্ধী-কথিত ‘বড়লোকের বখাটে ছেলে’ সুভাষ। জাতীয় কংগ্রেস ৬৩ বছরে যা করতে পারেনি, সুভাষচন্দ্র মাত্র তিনবছরেই সকলকে, অর্থাৎ হিন্দু- মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান

ফঃ ২

সবাইকে স্বাধীনতা যুদ্ধের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছেন--- একথা বলার 'অপরাধে' জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে হয় এক নেতাকে। ঈশান কোণে যখন আজাদি সেনারা ইঙ্গ- মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ লড়াই করছেন, তখনও জাতীয় কংগ্রেসের আবারও 'ভারতছাড়ো' ডাক দেওয়ার সাহস ও সাধ্য কোনোটাই হলো না। লালকেল্লায় আজাদি সেনার বিচার এবং নৌবিদ্রোহের মতো সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাননি জাতীয় কংগ্রেসের দেশহিতৈষী নেতারা। খুব সহজেই দ্বিজাতিতত্ত্বের মৃদু আঁচে হাওয়া দিয়ে সিমলার গোলটেবিলের আসরে দেশভাগে সমর্থন আর ক্ষমতার পিঠে ভাগ করে নিলেন তারা। বেতার মাধ্যমে নেতাজীর কাতর আবেদন এবং স্বাধীন, অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে তাঁর স্বপ্ন এভাবেই শেষ করা হলো।

আজাদ হিন্দের প্রতিফলিত গরিমায় বিপুল ভোটে খণ্ডিত ভারতের ক্ষমতায় বসলেন নেতাজীর একদা সহকর্মী সুহৃদরা। প্রথমেই আজাদি সেনাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো দপ্তরে বা সেনা ব্যারাকে নেতাজীর ছবি টাঙানো যাবে না বলে লিখিত ফতোয়া দেওয়া হয়। নেতাজীর চরিত্র হননের চক্রান্তের পাশাপাশি আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থ ও সম্পদ লুঠ, তাঁকে মৃত প্রমাণ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, পরিশেষে গোপনে নেতাজীর অবস্থান জানার জন্য এলগিন রোডের বাড়ি এবং নেতাজী ঘনিষ্ঠ বিপ্লবীদের ওপর নজরদারি অব্যাহত রইল। খণ্ডিত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নিজেই 'ভারতরত্ন' গলায় পরে নিলেন। সেই পথেই হেঁটেছিলেন নেহরু কন্যাও। তিনি ১৯৭২ সালে নেতাজী সংক্রান্ত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ধ্বংস করে দিলেন। সরকারি ভাবে নেতাজী অনুগামীদের ওপর নজরদারি অব্যাহত ছিল এবং কমিশন গড়ে নেতাজীকে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত প্রমাণ করার মতো কাজটি করেছিলেন তাঁর বাবার মতোই। প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলেন প্রকৃতিতে মা-মাকড়সার জীবন বড়ো মর্মান্তিক। শরীরে বেড়ে ওঠা খুদে মাকড়সারা শেষে তাদের মা মাকড়সাকেই খেতে শুরু করে। তিলে তিলে মা শেষ হয়ে যায়। যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা বুকে নিয়ে বহু মানুষ দেশের জন্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, আত্মবলিদান দিয়েছেন, সেই জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে গেল ইন্দিরা গান্ধীর বদান্যতায়। পরে সেই 'কংগ্রেস- আই' গ্রাস করে ফেলে পূর্বতন জাতীয় কংগ্রেসকে এবং সময়ের সঙ্গে আই-কংগ্রেস 'আইএনসি' হয়ে গেল নির্বাচনী ময়দানে। নেতাজী বিরোধিতার পারিবারিক ধারাবাহিকতায় 'জেনেটিক' পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। উত্তরসূরীরা চক্রান্তের জালে নেতাজী ও ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসটিকে প্রচারিত হতে দেয়নি। সেই ইতিহাসকে তারা উহ্য রেখেছে দশকের পর দশক। সত্য হয়তো সুপ্ত থাকে, কিন্তু চিরকাল গুপ্ত থাকে না। কিছু নির্বাচিত নেতাজী ফাইল প্রকাশ্যে আসতেই পূর্বতন পারিবারিক শাসকদের নেতাজীর প্রতি চক্রান্তের নির্মম স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

তবু তিনি নেতাজী। যাঁর মনীষাদীপ্ত, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ধারেকাছে আসেন না বিশ্বের কোনো মুক্তিকামী নেতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাত ধরে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। চরকাশোভিত পতাকা আর খদ্দরের পোশাকের মান রাখতে তাঁকে কম কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। রামগড়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের আপোশবিরোধী সম্মেলনে তিনি যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তা ছিল খাদির কাপড়ে বোনা, চরকাশোভিত, ত্রিবর্ণরঞ্জিত। আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব দপ্তর এবং বিভিন্ন দেশে এই সরকারের দূতাবাসের মাথায় চরকাশোভিত ত্রিবর্ণ পতাকা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের ত্রিবর্ণ পতাকায় থাকত লম্ফোদ্যত বাঘের চিত্র, কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেই সময় অতি পরিচিত চরকাশোভিত ত্রিবর্ণ পতাকাকেই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় পতাকার মর্যাদা দিয়েছিলেন একদা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ খারিজ হওয়া সুভাষচন্দ্র বসু।

ব্রিটিশ ভারতে পরাধীন দেশবাসীর মুক্তির কণ্ঠস্বর ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক মঞ্চ। দেশব্রতী বহু মানুষের আত্মত্যাগের সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী নেতৃত্বের আপোশকামিতা নির্ভীক দেশপ্রেমিকদের অপমানিত করেছিল। সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য দল, ফরোয়ার্ড ব্লক করার পরেও জাতীয় কংগ্রেসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন, কিন্তু বিনিময়ে নেতাজী সুভাষের সঙ্গে করা হয়েছে বড়ো মাপের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। বর্তমানের সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কা বঢরার কংগ্রেস কি পারবে তাদের পূর্বসূরীদের পাপমোচনের জন্য নেতাজী এবং আজাদ হিন্দের বঞ্চিত, বিস্মৃত সেনানীদের প্রতি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে? সুভাষচন্দ্রের সদস্যপদ সসম্মানে ফিরিয়ে দিতে পারবেন রাহুল গান্ধীরা? কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় মুখপত্রে নেতাজীর কার্টুন এঁকেছিল। তাঁকে 'কুইসলিং' আখ্যা দিয়েছিল। তাদের সেই কৃতকর্মের জন্য দুই কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের তাদের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় প্রতিবছর ২৩ জানুয়ারি রেড রোডে বেলা বারোটার সময়ে নেতাজীমূর্তির সামনের সভায় নিয়ম করে বলতেন যে নেতাজীর প্রতি তাদের সেদিনের মূল্যায়ন ভুল ছিল। দিকভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, জাতীয়তাবোধহীন কমিউনিস্টদের কাছে তাদের সব কৃতকর্মই এক একটি ঐতিহাসিক ভুল। বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট এবং বঙ্গ রাজনীতিতে ভোটব্যাংকের বাধ্য-বাধকতায় দেরিতে হলেও তারা ভুল স্বীকারে বাধ্য হয়। নেতাজীকে অসম্মানের দোষে একইভাবে জাতীয় কংগ্রেসও দুষ্ট। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনা তাদের কর্তব্য। বর্তমান কংগ্রেস কি পারবে সেই পথে হাঁটতে? □

নেতাজীর বিবাহ প্রচার এক বড়ো চক্রান্ত

বিপ্লব বিকাশ

সাধুরা বলেন যে 'এই সংসার সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে এক ভ্রমের মধ্যে রয়েছে। জ্ঞানী মানুষ সত্যান্বেষণ করেন আর সাধারণ মানুষ যা শোনে বা যেটা শোনানো বা বোঝানো হয় সেটাতে বিশ্বাস করে।' ভারত ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক ঘটনা আছে যেটার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে কিন্তু আমাদের সামনে ইতিহাসকে এভাবে রাখা হয়েছে যে আজকে সত্যটাই ভুল মনে হয়ে এবং ভুলটাকে সত্য। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিবাহ কথা প্রচার। নেতাজী নিয়ে গবেষণা করার যোগ্যতা এই লেখকের নেই কিন্তু ২৩ জানুয়ারি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেওয়া ছুটির দিনে 'জিলিপি রেস' খেলা খেলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকাটাও ঠিক নয়। আমাদের দায়িত্ব সত্যান্বেষণ করা।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের দেশে গবেষণার এবং বিমর্শ-প্রতিবিমর্শের বিষয় হয়ে গেছেন। তাঁর জীবন, মৃত্যু এবং জীবনের বিভিন্ন পর্ব যেমন তাঁর বিয়ে— এই সব গবেষণার বিষয় হয়ে গেছে। নেতাজীর বিয়েটা কি সত্যি না সাজানো গল্প? ওই গল্প যেটাকে কিছু ছবি, কিছু চিঠি, কিছু ঘটনাচক্রকে সাজিয়ে সত্য প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এটা করল কারা? কেন করলো? কীভাবে একজন সূর্যের মতো প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্বের জীবনচরিত্রে এই গল্পের প্রয়োজন হলো? তিনিও তো একটি রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন, হতেই পারে যে তিনি নিজের স্টেনোগ্রাফারকে বিয়ে করেছিলেন? একরকম বিভিন্ন হালকা প্রশ্ন আমাদের মনে স্বাভাবিক রূপে আসতে পারে বা আসে। নেতাজীকে যারা ভালোবাসেন তারা সত্যকে জানতে চান। নেতাজীর কথা যখন বলা হয় তখন একটা প্রশ্ন মনকে উদ্বেলিত করে— 'এটা কি সত্যি হতে পারে?'

'নেতাজীর তথাকথিত বিবাহকাহিনি মানুষকে খাওয়ানোর জন্য প্রথম ব্যবহার করা হয় এক 'পেটোয়া' হিন্দি সংবাদপাত্রকে। ...২২ এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রি: । এদিন সকালে ওই পত্রিকায় 'নেতাজী কে পত্নী' শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদে ভারতবাসী চমকে ওঠে। পত্রিকার সংবাদদাতা লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র বসু এক জার্মান মহিলাকে বিবাহ করেছেন। আট বছরের একটি পুত্র সন্তানও বর্তমান। ১৯৫১ খ্রি: সংবাদের শিরোনাম আবারও পেটোয়া 'সন্মার্গ' পত্রিকায়। তাদের প্রভাতী সংস্করণের অন্যতম সংবাদ— সুভাষচন্দ্র এক জার্মান মহিলাকে বিয়ে করেছেন। তাঁর একটি কন্যা সন্তান রয়েছে আট বছরের। অর্থাৎ 'সন্মার্গ' পত্রিকা দু'বছর আগে সুভাষচন্দ্রের আট বছরের পুত্র সন্তানের সংবাদ দিয়েছে। দু' বছর পরে আবার সেই পত্রিকাই জানাল নেতাজীর আট বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। ডাঃ মধুসূদন পালের নেতাজীর বিয়ে সম্পর্কে লেখা গবেষণামূলক বই 'বিবাহ গল্প কথা, শয়তানদের গুপ্ত গাথা'-তে যখন এই তথ্যটি পড়লাম তখন মনে হলো এই সংবাদ প্রকাশিত হলো কীভাবে? ডাঃ পাল লিখছেন, 'নেতাজী-এমেলির বিবাহকাহিনি জার্মানি, ইতালি সরকারের বা কোনো গোয়েন্দা সংস্থার গোচরে কেন এল না! বিন্দুবিসর্গ জানল না আজাদ হিন্দ ফৌজ/ইনডিপেন্ডেন্স লিগের কেউ, অথচ সেই সংবাদ পেয়ে গেল, 'সন্মার্গ' পত্রিকা ও জওহরলাল? ...এপ্রিল ১৯৪১-এ যে সন্তানের জন্ম, মাতৃগর্ভে তাঁর ভ্রূণ তৈরি হয়েছে বা ভ্রূণ প্রোথিত হয়েছে জন্মের ৯ মাস ১০ দিন অর্থাৎ ২৮০ দিন আগে। সময়টা হবে আনুমানিক ১৯৪০-এর জুন-জুলাই মাস। তখন সুভাষচন্দ্র বসু কোথায়?

ডাঃ পালের এই বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সন্তানোৎপত্তির জন্য মা-বাবাকে এক সঙ্গে থাকতেই হবে। '২ জুলাই ১৯৪০, জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের একান্তে আলোচনা হলো সকাল ১১টায়। এদিনই দুপুরে সুভাষচন্দ্রকে বন্দি করা হয়। তারপর থেকে সুভাষচন্দ্র ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে। এরপর তাঁকে রাখা হয় এলগিন রোডের তাঁদের নিজেদের বাড়িতে গৃহবন্দি হিসেবে। ...সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত ধর্মপত্নী এমেলি শেঙ্কল তখন কোথায়? ...জার্মানিতে'।

এই গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ডাঃ মধুসূদন পাল লিখেছেন, 'প্রকাশিত সংবাদের 'মিথ্যা' বা 'ভুল' অংশটা

সংশোধনের জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা দু'বছর অপেক্ষা করল কেন? ...নেতাজীর মেজদা শরৎচন্দ্র বসুও ছিলেন একটা বড়ো কারণ। তাঁর জীবিত অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি। ...২২ এপ্রিল ১৯৪৯-এ সন্মার্গ পত্রিকায় বিবাহ কাহিনি প্রকাশের পর উত্তরপ্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা রামগতি গাঙ্গুলি ১৯৪৯-এর ২৪ এপ্রিল শরৎবাবুকে পত্রমারফত জানতে চাইলেন, নেতাজীর বিবাহ নিয়ে যেসব খবর বাজারে উড়ছে তার সত্যাসত্য সম্পর্কে। কলকাতায় উডবান পার্কের বাড়ি থেকে ২৬ এপ্রিল ১৯৪৯ শরৎ বসু রামগতির প্রশ্নের উত্তর হিসেবে লিখলেন, আপনি কীভাবে এরকম মিথ্যাকাহিনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন? এরকম মিথ্যা লেখা উপেক্ষা করুন।'

শরৎবাবু ১৯৪৮ সালে ইউরোপ গেছিলেন। এই যাত্রার একাধিক কারণ ছিল। নিজের স্বাস্থ্যোদ্ধার আর যুদ্ধোত্তরকালে নেতাজীর সহযোগীদের সঙ্গে সংযোগস্থাপন এবং নেতাজীর সম্পর্কে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ। নিজের জীবনের পাঁচ দশক নেতাজী বিষয়ক চর্চার সঙ্গে যুক্ত এবং মুখার্জি কমিশনের একজন অন্যতম সাক্ষী ডাঃ মধুসূদন পাল লিখছেন যে শরৎবাবুর এই ইউরোপ যাত্রার একটি অন্যতম সংকল্প ছিল 'সুভাষচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে যেসব কাহিনি রটানো হয়েছে ও হচ্ছে তার সত্যাসত্য নিরূপণ'।

শরৎবাবু কী এমেলি সঙ্গে দেখা করেছিলেন? যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে তো এমেলির সঙ্গে সাক্ষাতের পর শরৎবাবুর মতামত কী ছিল? আপনার মনে হয়তো এই প্রশ্নটা ঘুরছে। স্বাভাবিক তো। যখন শরৎবাবু নেতাজীর বিবাহকাহিনির সত্যাসত্য জানার সংকল্প নিয়ে ভারত থেকে ইউরোপ গেছিলেন তখন তো তিনি সাক্ষাৎ করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন। ডাঃ পাল এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'ইউরোপে এমেলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শরৎবাবু মোটেই সন্তুষ্ট হননি। তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিলেন এমেলির আচরণে। নিশ্চিত হয়েছিলেন, সুভাষ-এমেলির তথাকথিত বিবাহ কাহিনি একটি বিরাট ধাপ্পা। বড়ো মাপের ষড়যন্ত্র। এই বিবাহের একমাত্র প্রমাণ, তাঁকে (এমেলিকে) লেখা 'সুবি'র (নেতাজীর আদরের নাম) চিঠি। এই চিঠিও যে জাল সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন একশো ভাগ। দেশে ফিরে এসেই শরৎবাবু বলেছিলেন, সুভাষের তথাকথিত বিবাহকাহিনি একটা মস্ত বড়ো ছলনা, মিথ্যাচার। তিনি 'Fraud' শব্দটা ব্যবহার করে বলেছিলেন, 'আমাকে ঠকানো হয়েছে'। ...'বসুমতী' পত্রিকায় শনিবার, ১৭ ভাদ্র ১৩৬৮ সংস্করণে 'নেতাজীর বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা বন্ধ করুন' 'শ্রী সত্যরঞ্জন বক্সীর আবেদন' এই শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল। (এই সংবাদে শ্রী বক্সী আবেদন করেছেন)। ১৯৪৮ সালে ইউরোপ থেকে ফেরার পর কিছুক্ষণের ভিতর আমি শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করি।... প্রশ্নোত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শরৎচন্দ্র বসু তাঁর ভিয়েনার অভিজ্ঞাতাবলীকে 'প্রবঞ্চনা' বলে খুবই জোরের সহিত বর্ণনা করেছিলেন।'

'সন্মার্গে' প্রকাশিত নেতাজীর তথাকথিত পুত্র বা কন্যা সন্তানের বয়স, জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে পুরো গল্প মনে হচ্ছে। শরৎবাবু মন্তব্য নিয়ে ডাঃ পাল যা লিখেছেন সেটা থেকে স্পষ্ট যে এমেলির সঙ্গে বিবাহের কাহিনিটা একটি গল্প শুধু নয়, একটা বড়ো রকমের চক্রান্ত। কিন্তু মনে একটি প্রশ্ন এখনো ঘুরছে, এই গল্পের রচনাকার কে এবং সে এমন কেন করলো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেও আমি এই গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখি— 'জানি, প্রশ্নটা তোমার মনেও খেলা করছে। তুমিও বুঝতে পারছ, এটা যৌন কেলেঙ্কারির নায়ক জওহরলাল আর তার সহযোগীদের সৃষ্টি।' কিন্তু এই গল্পের রচনাকার এমন করল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ৮ম পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে ডাঃ পাল লিখেছেন 'নেতাজীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের এই যে চক্রান্ত তার পেছনে কিছু স্বার্থান্বেষী-ক্ষমতাপিপাসু উচ্চস্তরের কংগ্রেস নেতৃত্বের, বিশেষত ইন্দ্রিয়পরায়ণ জওহরলালের ব্যক্তিগত প্রয়োজনটাই ছিল সর্বাধিক।' □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সুভাষকে ঘরে ফেরানো গেল না কেন?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশনায়কের এহেন অন্তর্ধানের রহস্যকে গোপন করার চক্রান্ত জাতীয় জীবনে এক চরম অকৃতজ্ঞতা।

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

‘নীলকণ্ঠ’কে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে, আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি, যে ব্যক্তি বলতে পারে, আমি সব যন্ত্রণা, ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি, সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে। আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে, নতুন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে, সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে, প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।’ গভীর মনোযোগী হয়ে ‘তরুণের স্বপ্নের’ অসমাপ্ত রচনার অবশিষ্ট উপসংহার শেষ না করেই আমার ছোট্ট এক রত্তি কন্যার অকস্মাৎ জিজ্ঞাস— বাবা, তুমি কি জানো না নেতাজী কবে মারা গিয়েছিল? ‘ছোট্ট কন্যার এই অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসা হাড় কাঁপানো মাঘের শীতল দেহে যেন এক লহমায় অশান্ত ক্রোধী সূর্যদেবের বিদ্যুৎবাণ নিক্ষেপিত হয়ে গেল। সংবিত ফিরতে ভাবলাম, সত্যই বটে, এটা কি প্রশাসনিক ব্যর্থতা, না জাতীয় দুর্বলতা, নাকি আমাদের চরম দুর্ভাগ্য।

সত্যি বলতে কী, মিথ্যা কখনো-বা সযত্নে আমার কন্যার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। চার দেওয়ালের শীতল নীরবতায় উপর্যুপরি জিজ্ঞাসা ক্রমেই প্রতিফলিত হতে লাগল, মনে হলো জাতির বিস্মৃত ইতিহাসের এ যেন এক সপাটে কষানো চড়। কালের কোনো অমোঘ নিয়মে শিক্ষকতাকে যে কখন ‘পেশা’ করে ফেলেছি, হিরণ্ময় নীরবতাই যেন শিক্ষকতা নামক পেশাকে লজ্জিত করে তুলল। দীর্ঘ দিন শিক্ষকতায় নিযুক্ত থেকেও নিজেকে বড়োই অপরাধী বলে মনে হতে লাগল, আশঙ্কায় বুক ভারী হয়ে প্রমাদ গুনতে লাগলাম, হয়তো চার দেওয়ালের মধ্যে ওর ছোটো বয়সে জিজ্ঞাসা আগামীদিনের জোরালো সোচ্চার দাবি না হয়ে ওঠে। আর ঠিক এভাবেই হয়তো যুগের পর যুগ আসবে, শহরে নগরে ধুলো বালি মাখা কাক-পক্ষীর কদর্য বিষ্ঠার আস্তরণের অমলিন অনাদরে সজ্জিত নেতাজীর মর্মর মূর্তিতে অশিক্ষিত দুর্নীতিবাজ ভেকধারী নেতা-মন্ত্রীরা লোক দেখানো কেতাবি ভাষণে গর্জে উঠবে ‘নেতাজী তোমায় আমরা ভুলছি না ভুলবো না’।

শিক্ষিত বাঙ্গালির একটা বড়ো অংশের সরকারি কর্মচারীরা স্ত্রী-পুত্রের ছোট্ট সংসার নিয়ে সুমুদ্র সৈকতে মদ-মাংসে মত্ত আমেজে তেইশে জানুয়ারির ছুটি কাটাবে। ঠিক এই ভাবেই অতৃপ্ত বাসনায় ক্লান্ত হতে থাকবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম, বিস্মৃত হতে থাকবে প্রবঞ্চিত হতাশাগ্রস্ত উত্তরসূরি, নব প্রজন্মের তাগিদ কমতে কমতে সত্যিই একদিন ইতিহাসের স্মৃতি থেকে মলিন হয়ে যাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান এই অপ্রতিরোধ্য যোদ্ধার প্রকৃত অন্তর্ধান

রহস্যের গোপন রসায়নটি। সুদীর্ঘ আটশো বছরের দীর্ঘ দাসত্বের খোলস ছাড়িয়ে ভারত মাতার যে বীর সন্তানের হাত ধরে এল ভারতের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, আজ সাতাত্তরটি বসন্ত পেরিয়েও আমরা তার খোঁজ নিলাম না, অনাদরে বিদায় দিলাম, 'নবকুমার'কে বাঘে খাইয়াছে'— ঠিক যেন এই সান্ত্বনায়। দেশ আর সরকারের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। দেশ হলো বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটা বাস্তব ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিফলন, যেখানে সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গড়ে ওঠা এক ব্যবস্থার নাম হলো সরকার। যেখানে তৈরি হওয়া এক সুষ্ঠু সাংবিধানিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত বাধ্যবাধকতা অপেক্ষা জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি তীব্র।

কারণ সরকারের সাংবিধানিক গভীরতায় অন্তর্নিহিত আছে জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনামা, সরকার যা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ স্বাধীনতার এই সুদীর্ঘ কয়েক দশক অতিক্রান্ত হবার পরেও দেশনায়কের অন্তর্ধান রহস্যের উন্মোচনে পরিলক্ষিত হলো এক নীতিগত ভ্রান্তিবিলাস। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের যে সুবর্ণ সুযোগটি লুকিয়ে ছিল, সুভাষচন্দ্র সেটি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিধি বাম, মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হলো সুভাষের সঙ্গে গান্ধীজীর সেই সময় হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজী লিখলেন, 'We don't want our freedom out of Britain's ruin'। সুভাষচন্দ্র চান পূর্ণ স্বরাজ আর গান্ধী চান ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রানির হাতে স্বায়ত্তশাসন। ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে, কিন্তু তার অনেক আগেই আন্দামান নিকোবরের পোর্টব্লেয়ারের জিমখানার মাঠে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করে ১৯৪৩ সালে ২০ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বসু সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। তাহলে সেই অর্থে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা উচিত ছিল ৩০ ডিসেম্বর, আর সুভাষচন্দ্র বসু হলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। না, এত বড়ো সত্য আগামী প্রজন্মের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চায়নি কংগ্রেস। তাই নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তথ্যকে সামনে এনে নেতাজীর অত্যন্ত দুই সহযোগী ছায়াসঙ্গী হাবিবুর রহমান ও শাহনওয়াজের মাধ্যমে জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো এক মনগড়া ইতিহাস। কিন্তু কী আশ্চর্য, একবারও ভেবে দেখা হলো না যে, নেতাজীর শেষজীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী ক্যাপ্টেন হাবিবুর রহমান ওই একই বিমানে থেকেই কীভাবে রহস্যজনকভাবে বেঁচে গেলেন, পরে যিনি দেশভাগের পরেই পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে যুক্ত হন এবং পরে ডিফেন্স সেক্রেটারি তথা পাক অধিকৃত কাশ্মীর প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ করে কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহকে বিতাড়ন বাধ্য করলেন? এবং যার জন্য পাকিস্তান সরকার তাঁকে এই সাফল্যের জন্য নানান উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভারত তথা নেতাজী প্রীতি নিয়ে কীভাবে অন্য আর এক বিশ্বস্ত ছায়াসঙ্গী শাহনওয়াজ সুবিধাবাদী কংগ্রেসি রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে কাদের অঙ্গুলিহেলনে কোনো প্রমাণ ছাড়াই ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট নেতাজীর মৃত্যুদিনটিকে মান্যতা দিলেন? যে কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই কংগ্রেসে কোন সুবিধা পেয়ে লোকসভায় চারবার সাংসদ হয়ে একাধিকবার সংসদীয় রাজনীতিতে একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন? এই ইতিহাস জানতে হবে এবং জানাতে হবে নব প্রজন্মকে। কোথায়, কী সমস্যা, কাদের স্বার্থ আড়াল করতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশনায়কের অন্তর্ধান রহস্য গোপন করে রাখা হলো? অতীতের দু'টি কমিশন, কয়েকটি তদন্ত কমিটি এবং সাম্প্রতিক অতীতের মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে উঠে আসা প্রামাণ্য দলিল কাদের অঙ্গুলিহেলনে বিগত সরকার বাহাদুর উপস্থাপন করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন? স্বাধীন ভারতকে সবচেয়ে বেশি শাসন করার সুযোগ পেয়েছিল কংগ্রেস সরকার, তাহলে কোন গোপন কেচ্ছাকে আড়াল করতে এই কাজটি সম্পন্ন করতে দ্বিধা বোধ করল কংগ্রেস সরকার?

জহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কীভাবে ভুলে গেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ছাব্বিশ হাজার বীর সৈনিকের বীরগতি প্রাপ্তির ইতিহাস? তাহলে ধরে নিতে হয়, নিশ্চিত কোনো গোপন দুরভিসন্ধি আছে এই তদন্তে যা উন্মেচিত হলে কংগ্রেসের পরিবার তান্ত্রিক দেউলিয়াপনার ফাটলটা আরও চওড়া হয়ে যাবে? দীর্ঘ কয়েক দশকের বৈদেশিক শাসনের বিষ নিঃশ্বাসে ভারতবর্ষ জুড়ে যখন অধিষ্ঠিত গ্লানিময় দাসত্ব ব্যবস্থা, নিদারুণ বর্বরতায় ছায়াসুনিবীড় স্নিগ্ধ ভারতীয় অমরাবতী যখন অসম্ভব দহন জ্বালায় দগ্ধীভূত, করুণ মানবাত্মার বিস্তীর্ণ চিতাশয্যার অন্তরালে ভয়ানক প্রকট অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস যখন ভারতীয় সংস্কৃতিকে নগ্ন করে ফেলেছে, সীমাহীন পাশ্চাত্য লাম্পট্যের সুতীব্র আগ্রাসনে জাতীয় কৌলীন্য যখন প্রায় অস্তমিত— এমনই এক সংকটঘন নৈরাশ্যময় সুপ্তিমগ্ন স্থবির ভারতবর্ষে অসহায় পীড়িত অন্নপূর্ণার সন্তানদের নায্য অধিকার ও মর্যাদার অভিষেক ঘটাতে এক দুষ্প্রাপ্য ভারতরত্নের আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটেছিল। পরাধীন ভারতের বৃহত্তম সার্বজনীন মাঙ্গলিক চেতনার সফল উত্তোরণের উদ্দেশ্যে যার উদাত্ত কণ্ঠ গর্জে উঠেছিল— 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'।

প্রবল উন্মাদনায় শুরু হলো ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবময় আবেগতাড়িত অধ্যায়। ভারতাত্মার জ্যোতির্ময় প্রতীক, স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত এই বিগ্রহ দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পর্যুদস্ত করে বিপর্যস্ত ভারতমাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল বহু প্রতিক্ষিত যে স্বাধীনতা, কালের অমোঘ নিয়মে স্বাধীন ভারতের কতিপয় রাজনৈতিক অপনেতার চরম দুরভিসন্ধিতে, পারিবারিক কদর্যের কাহিনিকে গোপন করতে গিয়ে এত বছর পরেও শ্রদ্ধেয় সেনানায়কের প্রাপ্য মর্যাদার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি প্রদানে পরিলক্ষিত হলো দুর্জয় ভ্রান্তিবিলাস। চরম অবহেলা আর নিদারুণ অবমাননায় মহানায়কের এই দুরতিক্রম্য অস্তিত্বকে বন্দি করে রাখা হলো রাস্তায় খোলা মোড়ে ধুলো মাখা মর্মর প্রস্তরখণ্ডে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো দেশনায়কের এহেন অন্তর্ধানের রহস্যকে গোপন করার চক্রান্ত জাতীয় জীবনে এক চরম অকৃতজ্ঞতা।

এখন কেন্দ্রে রাষ্ট্রবাদী এনডিএ সরকার। দেশবাসীর প্রত্যাশা এই সরকারের কাছে অনেক বেশি। অনেক সাহসী পদক্ষেপের স্রষ্টা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বজ্রকঠিন অভিভাবকত্বের কাছে শুধু একটাই অনুরোধ, অনুগ্রহ পূর্বক এই মহান দেশনায়কের অন্তর্ধান রহস্য অবিলম্বে উন্মোচিত করার ব্যবস্থা করা গ্রহণ করুন। ▯

নেতাজীকে দেওয়া প্রবাসী ভারতীয়দের বিপুল অর্থ-সম্পদ গেল কোথায়?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সুভাষের মাথায় তখন এক নতুন চিন্তা। টাকা চাই। প্রচুর টাকা। হাজার হাজার সেনা, হাজার হাজার লিগ কর্মী, এদের শিক্ষা, থাকা-খাওয়া, পোশাকাদির জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা চাই।

তিনি বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর কাছে অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য। সর্বস্ব দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাও। শৃঙ্খলিত ভারত জননীর কান্না শুনতে পাচ্ছ না? তোমরা তাঁরই সন্তান। তাঁর মুক্তির জন্য সর্বস্ব দাও। সব দিয়ে নিঃস্ব, ফকির হয়ে যাও।' তাঁর এই আহ্বানে প্রভূত পরিমাণে তিনি সাড়া পেলেন।

বিখ্যাত জেয়াওয়াড়ডি এস্টেটের মালিক তাঁর সর্বস্ব তুলে দিলেন নেতাজীর হাতে। ব্যবসায়ী করিমগনি ফকির হলেন সবকিছু দিয়ে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ভুপেন্দ্র কুমার চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী জ্যোৎস্না চৌধুরী দিলেন অলংকার এবং নগদ অর্থ মিলিয়ে মোট ৪৮ লক্ষ টাকা। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার বি. ঘোষ তাঁর নিজস্ব কারখানা-সহ তাঁর সর্বস্ব তুলে দিলেন নেতাজীর হাতে। আর এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী শ্রীমতী হীরাবাঈ বেতাই তাঁর নিজস্ব যা কিছু ছিল সব তুলে দিলেন দেশের জন্য। নিজামি সাহেব দিলেন সাতাশ লক্ষ টাকা। বসির আহমেদ বিভিন্ন কিস্তিতে দান করলেন বহু লক্ষ টাকা। শুধু বর্মা থেকেই পাওয়া গেল পঁচিশ কোটি টাকা। রবার বাগানের এক-চতুর্থাংশ শেয়ার দান করলেন পেরাকের উত্তম সিংহ। কুয়ালালামপুরের এক জনসভায় মিনিট কয়েকের মধ্যে পাওয়া গেল সত্তর লক্ষ ডলার।

সেদিন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ত্রিশলক্ষ নরনারী যেভাবে নেতাজীকে ভালোবেসে তাদের যথাসর্বস্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, জাগতিক সংসারে এর চাইতে বেশি কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারেনি। শুধু পুরুষেরাই নয়, মেয়েরাও সেদিন এক-এক করে প্রায় সবাই তাঁরা তাঁদের সমস্ত অলংকার খুলে দিয়েছিলেন তাঁদের একান্ত প্রিয় নেতাজীর হাতে। এমনকী মঙ্গলসূত্রও তাঁরা দিতে দ্বিধা করেননি। যেন একটা উন্মাদনায় পেয়েছিল সবাইকে।

সে সময়ে নেতাজীর এক একটা ফুলের মালা, তাই নিয়ে হয়েছে কত নিলাম! কত কাড়াকাড়ি! এ যদি এক লাখ বলে তো অন্যজন হাঁক দেয় পাঁচলক্ষ। সব যায় তো যাক, তবু নেতাজীর ওই মালাটা তার চাই।

ঝাঁসির রানি বিগ্রেডের কমান্ডার লে: মিস্ থিবার্স তাঁর 'বিদ্রোহী কন্যার রোজনামচা' গ্রন্থে লিখেছেন— 'প্রথমে ডাক উঠল এক লক্ষ টাকা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অঙ্ক বেড়ে সাত লক্ষে পৌঁছল। একটি ধনী পাঞ্জাবি যুবক প্রথম ডাক দিয়েছিল। যখন টাকা বেড়ে গিয়ে সোয়া চার লক্ষ হয়েছে, তখন সে চীৎকার করে বলল, পাঁচ লক্ষ। কিন্তু ডাক যখন সাত লক্ষে পৌঁছল, তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত হলো। মনে মনে তার তখন আলোড়ন চলছে। যেমনটি মালা বিক্রি হলো বলে ঘোষণা করা হবে, সেই সময় সে লাফিয়ে মঞ্চের উপর উঠে পড়ল। উঠে চীৎকার করে বলল, 'আমার যত অর্থ আছে, পাই পয়সা পর্যন্ত সব দেব।' ছেলেটি তখন কাঁপছে। নেতাজী দু'হাত দিয়ে তাঁকে ধরে বললেন, 'ঠিক আছে, মালা তোমারই রইল। আমার ফৌজ যুদ্ধ করে তোমার মতো দেশ প্রেমিকের মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়ে দেবে।' ছেলেটি মালাটি নিয়ে তার চোখে মুখে বুকে রাখছিলেন। সে বলল, 'আমার নিজের কিছুই রইল না, এখন আমি ফৌজে ভর্তি হবো। দেশের মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করব'।

সেদিন সবাই যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল নেতাজীর ডাক শুনে— সর্বস্ব দিতে হবে। পেনাঙে তাঁর সেই ডাক শুনে এগিয়ে এল অল্পবয়সি একটি কিশোর। হাতে তার একটি সামান্য ফুলদানি। মায়ের দেওয়া এই ফুলদানিটা ছাড়া নেতাজীকে দেবার মতো আর কিছুই তার নেই। মায়ের দেওয়া শেষ চিহ্ন, এর অপরিসীম মূল্য হিসেবে নেতাজী চাইলেন পঁচিশ হাজার ডলার। বহু দাবিদার উঠে দাঁড়ালো। একজন পঞ্চাশ হাজার ডলার, তো আর একজন এক লক্ষ। শেষ পর্যন্ত ফুলদানিটা বিক্রি হলো এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলারে।

এমনি একদিনের ঘটনা। নেতাজী তখন ব্যাংককে। তাঁর ডাক শুনে প্রথম এগিয়ে এল সহজ সরল এক গোয়ালা। পকেটে তাঁর দুশো ডলারের নোট। মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি

বললেন, একশো ডলার তুমি রেখে দাও ভাই, নইলে তোমারই-বা চলবে কী করে? কিন্তু তাতে সে রাজি নয়। শেষে বিশ ডলার নিজের কাছে রেখে বাকিটা জমা করে দিল। কিন্তু তা আর কতক্ষণ! যেই না নেতাজী তাঁর ভাষণে আর একবার বলেছেন— 'সর্বস্ব দাও', অমনি সে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে সেই বিশ ডলার জমা দিল। এবার তার সারা মুখে প্রশান্তি। নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন, তার ওপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না।

ওদিকে তখন লাইন পড়ে গিয়েছে গোয়ালা সম্প্রদায়ের। সবার হাতে তেল-চিটচিটে পাশবই। পাশবই একে একে জমা দিয়ে তারা ফিরে গেল নিজের ঘরে। তাদের মুখে প্রশান্তির উজ্জ্বল আভা। নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন, তারাও সর্বস্বই দিয়েছে। ব্যাস, ঝামেলা মিটে গেছে। কিন্তু একি! দেখা গেল পরদিনই আবার তারা এসে ভিড় করছে লাইন দিয়ে। সারা মুখে তাদের অপরাধের চিহ্ন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল— নেতাজী সর্বস্ব দিতে বলেছেন কিন্তু কাল টাকা পয়সা সব দিলেও গোরু-মোষগুলোর কথা একদম মনে হয়নি। তাই আজ ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, নেতাজীকে দেবে বলে।

বিস্ময়ের ধাক্কা খেলেন জেনারেল চ্যাটার্জি। সঙ্গে ওদের অসংখ্য গোরু-মোষ! হাজার হাজার! জেনারেল চ্যাটার্জি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও সফল হলেন না। তাদের এক কথা--- ওগুলো না নিলে নেতাজীর কথা অমান্য করা হবে যে!

বাধ্য হয়েই রাজি হলেন নেতাজী। ওদের ভালোবাসার দান কি অস্বীকার করা চলে! তাহলে ওরা মনে মনে আহত হবে যে! এগুলো থাক। ওদের থেকে যা দুধ পাওয়া যাবে তা সব জওয়ান ভাইদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওদেরই তো সর্বাগ্রে সুস্থ থাকা দরকার।

পরবর্তীকালে এই গোয়ালাদের নিয়ে মজা কম হয়নি। যুদ্ধশেষে ব্রিটিশ কমান্ডার ফিনলের সেকি চোটপাট ওদের ওপর! কেন তোমরা নেতাজীকে সবকিছু দিয়েছ বল?

---কী করব সাহেব, নেতাজী দিতে বললেন যে!

—বললেই দিতে হবে? চুপ করে রইলে কেন, জবাব দাও?

—বাঃ, আমরা কি জানি? নেতাজী দিতে বললেন যে!

—ইডিয়ট! চাইলেই যে দিতে হবে তার কী মানে আছে?

—তুমি কী করে বুঝবে সাহেব? তুমি তো আর নেতাজীর ডাক শোননি! ও ডাক শুনলে তুমিও সব দিয়ে দিতে।

সত্যিই তাই। সামান্য ভিখারিও সেদিন পিছিয়ে থাকেনি। তাঁর ডাক শুনে ভিখারিরাও তাঁর সবকিছুই সেদিন তুলে দিয়েছিল নেতাজীর হাতে। এ সম্পর্কে আইএনএ সেনানী শাহনওয়াজ খান বলেছেন— 'সবাই লাইন দিয়ে নেতাজীর সামনে এসে টাকা দিয়ে যেতে লাগলো। বেশ মোটা টাকাই দিচ্ছিলো সবাই। হঠাৎ দেখি, একটি নিঃস্ব স্ত্রীলোক মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। পরনে তার শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, মাথায় কাপড়ও জোটেনি। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনটি টাকা সে নেতাজীর সামনে এগিয়ে দিল। নেতাজী বেশ বিব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। করুণভাবে বলল স্ত্রীলোকটি— 'এই আমার সর্বস্ব। আর কিছু নেই'। দেখতে দেখতে নেতাজীর দু'চোখ জলে ভরে এল। তারপরই তিনি টাকা তিনটি গ্রহণ করলেন হাত বাড়িয়ে।

আমার জিজ্ঞাসার জবাবে পরে নেতাজী আমাকে বলেছিলেন, আমি বুঝেছিলাম, ওই ওর যথাসর্বস্ব। ও টাকা আমি নিলে পরে ওকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য ওর যা কিছু ছিল, সব দিতে এসেছে। ওকে প্রত্যাখ্যান করে ওর মনে আমি দুঃখ দেব কী করে? আমার কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার চাইতে ওর ওই তিনটি টাকার মূল্য যে অনেক বেশি।'

এসবই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মহান চরিত্র, অতুলনীয় সাহস ও অনন্যসাধারণ উদারতার গুণে। লোকে তাঁকে হৃদয়ের পূজা দিয়েছে, প্রীতি দিয়েছে, দেবতা জ্ঞানে নয়, তার মধ্যে সত্যিকার মানুষ, বীর, বন্ধু ও সঙ্গীর দেখা পেয়েছে বলে।

নেতাজী তো অর্থ সংগ্রহ করলেন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য, কিন্তু ১৯৪৪ সালে তাঁর সংগৃহীত সেইসব অর্থ-সম্পদ গেল কোথায়?

১. ১৩০ কিলো সোনা (যার মধ্যে ১৯৪৪ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনে তাঁর মতের বিরুদ্ধে জনগণ তাঁদের প্রিয় নেতাজীকে সোনা দিয়ে ওজন করে উপহার দিয়েছিলেন, সেটাই প্রায় ৮৫ কিলো)।

২. আজাদ হিন্দ ব্যাংকে ৪২ কোটি টাকা ও ২৯০০ সোনার সিক্কা।

৩. হিটলারের দেওয়া সোনার সিগারেট কেস, তোজো (জাপানের প্রধানমন্ত্রী) ও মুসোলিনির (ইতালির প্রধানমন্ত্রী) দেওয়া বিভিন্ন দামি উপহার।

৪. ১৮,৪০০ ক্যারেটের পান্না, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য ৬০ লক্ষ আমেরিকান ডলার।

৫. ১৭,৮৮০ ক্যারেটের পান্নার বুদ্ধমূর্তি, যার বর্তমান মূল্য আন্দাজই করা যাচ্ছে না।

৬. ১৪,৭০০ ক্যারেটের ১৭০ বছরের পুরনো পান্নার বুদ্ধমূর্তি, যার বর্তমান মূল্য ১৫ লক্ষ আমেরিকান ডলার। পুরো সম্পত্তির বর্তমান মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১০০০ কোটি আমেরিকান ডলার।

এখন প্রশ্ন, এই বিপুল সম্পত্তি কোথায় গেল?

শোনা যায়, ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এর সেই নাটকীয় বিমান দুর্ঘটনার পর সাতদিনের মধ্যেই জাপান সমস্ত সম্পত্তি নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজেরই রামমূর্তি ও আইয়ারের হাতে তুলে দিয়েছিল। রামমূর্তি ও আইয়ার সেই সম্পত্তি নয়ছয় করতে থাকলে জাপান পরপর তিনবার ভারত সরকারকে সরকারিভাবে তা জানায়, কিন্তু নেহরু তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা তাঁদের পুরস্কৃত করেন। শোনা যায়, ১৯৪৬ সালে নেহরু সিঙ্গাপুর যান ওই সম্পত্তি ভাগাভাগি করার জন্য। মাউন্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে সেই সম্পত্তি ভাগ হয় এবং রামমূর্তি ও আইয়ারও কিছু ভাগ পান বলে জানা যায়। তাই নেহরু সিঙ্গাপুর গিয়েও আজাদ হিন্দের স্মৃতিসৌধে মালা দিতে যাননি, এমনকী মাউন্টব্যাটেন ওই স্মৃতিসৌধ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলেও তার প্রতিবাদ করেননি। এজন্যই কি নেহরুর পরিবারের বর্তমান সম্পত্তি ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের থেকেও বেশি?

নেতাজী কথা রেখেছিলেন, তিনি আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এবার আমাদের পালা তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেবার এবং সত্য ইতিহাস সকলের সামনে মেলে ধরার। □

ভাববার মতো কিছু কথা

অমিত চৌধুরী

(১) ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন হলো কিন্তু লোক বিনিময় হলো না। সেসময় জিন্না, আম্বেদকর প্রমুখ রাজি থাকলেও গান্ধীজী ও নেহরু লোকবিনিময়ে রাজি হলেন না।

(২) ভারত ভেঙে তিন টুকরো করা হলো। পাকিস্তান ইসলামি দেশ হলেও ভারতকে হিন্দুস্থান করা হলো না।

(৩) পাকিস্তানে (পূর্ব ও পশ্চিম) সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ কোনো অধিকার নেই, ভারতে ঠিক এর বিপরীত।

(৪) পাকিস্তানে একবারের জন্যও কোনো অমুসলমানকে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী করা হয়নি।

(৫) ভারতের ক্রিকেট দলে মুসলমান খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেলেও পাকিস্তান বা বাংলাদেশে তা তেমন চোখে পড়ে না।

(৬) বহু মুসলমান গায়ক, অভিনেতা, কলাকুশলী পাকিস্তানের পাশাপাশি ভারতেও নিজের প্রতিভার প্রদর্শন করছেন কিন্তু ভারতের কোনো হিন্দু শিল্পী সেদেশে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

(৭) পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা চিন্তাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৮) ভারতে স্বাধীনতার পর হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আড়াই গুণ এবং মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে সাড়ে চারগুণ।

(৯) পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলেও ভারতে রমরমিয়ে মাদ্রাসা-মক্তব ও কনভেন্ট স্কুল চলছে।

(১০) ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দুরা কোনো ধর্মীয় বা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াতে না পারলেও মুসলমান বা খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে তাতে কোনো বাধা নেই।

(১১) ভারতের হিন্দুপ্রধান রাজ্যে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকলেও কোনো মুসলমানপ্রধান রাজ্যে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীর উদাহরণ পাওয়া যায় না।

(১২) ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বহু মুসলমান বিচারপতি হলেও বাংলাদেশের একমাত্র হিন্দু বিচারপতিকে ইসলামি দেশ বলে অপসারণ করা হয়।

(১৩) ভারতে শরিয়া আইনের কথা বলে মুসলমানরা চারটি বিয়ে করতে পারলেও হিন্দুদের জন্য একাধিক বিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(১৪) বিশ্বের কোনো ইসলামি দেশ সেকুলার না থাকলেও ভারতকে সেকুলার দেশের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

(১৫) ভারতের সংবিধানে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ঘোষণা করার পরও পৃথক মাদ্রাসা বোর্ড কেন?

(১৬) সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও হিন্দু মন্দির-সহ অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারি হস্তক্ষেপ কেন থাকবে?

(১৭) বিশ্বের কোনো দেশে তিনতালাক, ওয়াকফ বোর্ড, মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড নেই, তাহলে ভারতে তার কীসের প্রয়োজন?

(১৮) দেশে যাতে জাতিগত দাঙ্গা না হয় তার জন্যই দেশ বিভাজনকে

ফঃ ৩

তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব মেনে নিলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির খেলায় দাঙ্গা অহরহ ঘটে চলেছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই হিন্দুদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে।

(১৯) হিন্দুর শাসনে থাকলে মুসলমানরা ভালো থাকবে না বলেই দেশ ভাগ করা হলো, অথচ বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা ভারতের চেয়ে বেশি খারাপ।

(২০) কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি-সহ অন্যান্য দল স্বাধীনতার পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশে না থাকলেও ভারতে মুসলিম লিগ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই রয়েছে।

(২১) পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুদের ফেলে আসা সমস্ত সম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি এবং এখনও বসবাসকারী হিন্দুদের বহু সম্পত্তি সরকারি হস্তক্ষেপে দখল হয়ে গেছে, অথচ ভারতে মুসলমানদের সম্পত্তি এখনও যথাবৎ রয়েছে।

(২২) ভারতে বহু রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানের নাম অত্যাচারী মুসলমান শাসকদের নামে থাকলেও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দু মহাপুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

(২৩) ভারতে Muslim India নামে পত্রপত্রিকা চলে, কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে Hindu Pakistan বা Hindu Bangladesh নামে কোনো পত্রপত্রিকা স্বপ্নেও ভাবা যাবে না।

(২৪) বর্তমান ভারতের মুসলমানপ্রধান এলাকা দিয়ে হিন্দুদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা শোভাযাত্রায় পাথর ছোঁড়া, মূর্তি ভাঙা প্রভৃতি নানান আক্রমণ হতে দেখা যায়।

(২৫) কোনো মুসলমান মেয়ে হিন্দু ছেলের সঙ্গে প্রেম করলে বা বিয়ে করলে সেই হিন্দু পরিবার-সহ পুরো হিন্দু পাড়াটাই মুসলমানদের আক্রমণের শিকার হতে দেখা যায়।

(২৬) ভারতে বহু হিন্দু এলাকায় ভয় দেখিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে প্রকাশ্য ধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

(২৭) হিন্দু সংগঠনগুলির বিরোধিতা করতে হিন্দুদেরই বেশি দেখা যায়। অথচ কখনও কোনো মুসলমানকে কোনো ইসলামি সংগঠনের বিরোধিতা করতে দেখা যায় না।

(২৮) যে কমরেডরা ধর্মকে আফিম বলে ভাষণ দেন তারাই মুসলমান এলাকায় মুসলমানদের উপাসনা পদ্ধতির গুণগান করে আসেন।

(২৯) কমরেড বিকাশ ভট্টাচার্য গোমাংস খেয়ে নিজেকে সেকুলার প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও কখনও মহম্মদ সেলিমকে কেউ কোনোদিন শুয়োরের মাংস খেয়ে প্রমাণ দিতে বলেনি।

(৩০) পূর্ববঙ্গের সমস্ত সম্পত্তি খুইয়ে কমরেডরা ভারতে এসে এপারের হিন্দুদের বহু জমি বর্গাদার প্রথার নাম করে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়।

(৩১) যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হিন্দু সংগঠনগুলি মত-পন্থ নির্বিশেষে সকলের ত্রাণ ব্যবস্থা করে কিন্তু কোনো মুসলমান সংগঠনকে হিন্দু এলাকায় সেবাকাজ করতে দেখা যায় না।

(৩২) হিন্দুরা ক্রিসমাসের অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে চার্চে গিয়ে যিশুকে সম্মান প্রদর্শন করে কিন্তু কোনো খ্রিস্টানকে কেউ কখনও হিন্দু মন্দিরে আসতে দেখেছে কি?

(৩৩) শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুললেও কখনও যিশু বা হজরত মহম্মদ সম্পর্কে কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে দেখা যায় না।

(৩৪) বাইবেলে বা কোরানে পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে যে তথ্য দেওয়া আছে তা বিজ্ঞান পুরোপুরি অস্বীকার করলেও সেসব নিয়ে কোনো মন্তব্য করা যাবে না।

(৩৫) বাইবেলে বলা আছে পৃথিবী মাত্র চারহাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে, যা বিজ্ঞান ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে। টেরেসা-সহ বহু মিশনারি প্রতিষ্ঠানই বাইবেলকেই মান্যতা দেয়, তা সত্ত্বেও তারা নাকি বৈজ্ঞানিক, আধুনিক।

(৩৬) হিন্দুরা জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। মুসলমানরা হিন্দুর বুকে ছুরি মেরে ভারতকে টুকরো করেছে।

(৩৭) কোরানে অহিন্দুদের সম্পর্কে মারাত্মক আচরণের বিধান থকা সত্ত্বেও কোরান ভারতে চলতে পারে কিন্তু গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়ালে আপত্তি।

(৩৮) ভারতের প্রত্যেকটি মত-পন্থে নারী জাতিকে চরম শ্রদ্ধার স্থান দেওয়া হলেও মুসলমান বা খ্রিস্টানদের কাছে নারীর কোনো রকম সম্মান তো দূরের কথা বরং বহুক্ষেত্রেই শাস্তির বিধান দেওয়া আছে। তা সত্ত্বেও হিন্দুদের নামে তথাকথিত সেকুলারদের গালিবর্ষণ বন্ধ হয় না।

(৩৯) হিন্দুরা ২৫ ডিসেম্বর চার্চে গিয়ে হই-হুল্লোড় করেন কিন্তু খ্রিস্টানদের হিন্দু মন্দিরে গিয়ে হিন্দু দেব-দেবীকে প্রণাম করতে দেখা যায় না।

(৩৯) ভারতের হাজার হাজার মন্দির মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস করা হলেও তার পুনরুদ্ধার করা নাকি অবৈধ।

(৪০) ভারতে সুপ্রিম কোর্ট থাকা সত্ত্বেও ওয়াকফ বোর্ডের নিজস্ব আদালত রয়েছে যার উপর কারোরই হস্তক্ষেপ করা চলে না।

(৪১) দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারলেও কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই ওয়াকফ সম্পত্তি ঘোষণা করা হলে তা নিয়ে সরকারের কিছু বলার অধিকার নেই।

(৪২) বহু সরকারি প্রতিষ্ঠানে নমাজ পড়ার স্থান গড়ে তোলা হচ্ছে। শুক্রবার মুসলমানদের জন্য অধিক সময় ছুটি থাকছে।

(৪৩) সরকারি ব্যয়ে ইসলামি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, কিন্তু কেবল হিন্দুদের জন্য এরকম কিছু নেই।

(৪৪) মুসলমানদের যেখানে সেখানে আল্লার নামে স্লোগান দেওয়া বৈধ, অথচ হিন্দুদের জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেওয়াটা নাকি অপরাধ।

(৪৫) পাড়ার মোড়ে মোড়ে সবুজ পতাকা বা আইএস-এর পতাকাতে আপত্তি না থাকলেও গেরুয়া পতাকা সব জায়গায় তোলা নাকি নিষেধ। □

সমরসতা, সমাজ রক্ষায় মাতৃশক্তি

সুতপা বসাক ভড়

সমরসতা অর্থাৎ সমান রস— সমান আনন্দ। আমাদের সমাজে জাতপাত, উঁচু-নীচু সবরকম ভেদভাব তুলে সকলে মিলেমিশে বসবাস করাই হলো সমরসতা। রাষ্ট্রীয় একতা রক্ষার জন্য আবশ্যক হলো সুস্থ ও সংগঠিত সমাজ। উদাহরণস্বরূপ, শরীরের সকল অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকলে অর্থাৎ সমরসতা থাকলে শরীর সুস্থ থাকে; সেরকম দেশের একতার জন্যও সম্পূর্ণ সমাজ সুসংগঠিত হওয়া আবশ্যক। দুধের মধ্যে যেমন গুড় অথবা চিনি মিশে দুধকে আরও সুস্বাদু করে তোলে, ঠিক সেই প্রকার সমাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য মিলেমিশে গড়ে তোলে একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা, যেখানে কোনোরকম ভেদাভেদের অস্তিত্ব থাকে না।

সমরসতা বজায় থাকলে গড়ে ওঠে একটি সুস্থ সমাজ। সবল সমাজ হলো এখন একটি জাগ্রত সমাজ, যেখানে থাকে স্বাভিমানবোধ, নিজের জীবনমূল্যের প্রতি আত্মবিশ্বাস, নিজস্ব পরম্পরা, আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি গর্ব এবং সেগুলি সর্বত্র প্রসারিত করার সদিচ্ছা। সুসংগঠিত সেই সমাজ হলো সবল সমাজ। সবল সমাজে সকলের মধ্যে দুঃখ-সুখের সম-অনুভূতি থাকে; যেমন আমাদের পায়ে আঘাত লাগলে মস্তিষ্ক, হাত, চোখ ইত্যাদি সকল অঙ্গ হয়ে ওঠে সক্রিয়। সেইরকম সমাজেও সর্বত্র সমরসতা পরিলক্ষিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের হিন্দুসমাজ যখন সবল ছিল, তখন শক, হুনের মতো বহু বর্বর আক্রমণকারীদের পরাজিত করে আত্মসাৎ করা হয়েছে। সর্বপ্রকার বৈভবের দ্বারা বৈভবশালী হয়ে বিশ্বগুরুর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে।

স্ব-এর বিস্মৃতি এবং উদ্দেশ্যহীনতার কারণে সমাজ নির্বল হয়ে পড়ে এবং দীনহীন অবস্থায় পৌঁছায়। এই প্রকার স্থিতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থ অহংকার বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ ছোটো ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। জাতি ও পন্থের মিথ্যাভিমান বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রভাবহীনতা সমাজকে করে তোলে দুর্বল।

কেবলমাত্র সবল সমাজেই ব্যক্তিগত সুরক্ষা, মান-সম্মান এবং বিকাশ সম্ভব। পরাধীনতার কালে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে যথেষ্ট মান্যতা দেওয়া হয়নি। জাপানের বিদ্যার্থীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ শুনতে অস্বীকার করে। দুর্বল সমাজের জন্য দেশ হয়েছিল পরাধীন।

সমাজ সবল করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে স্ব-এর জাগরণ এবং অনুশাসন থাকা অত্যাবশ্যক। শ্রীরামচন্দ্র জনজাতি সমাজের মানুষদের সুসংগঠিত করেছিলেন। সবল সমাজ সৃষ্টির জন্য সমর্থ স্বামী রামদাস গ্রামে গ্রামে আখাড়া এবং হনুমান মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সমাজকে একসূত্রে বেঁধে রাখার জন্য ভগবান বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য মহাপ্রভু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতার মতো মনীষীরা নিজেদের জীবন দিয়ে সমরসতার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রেখে গেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কীভাবে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলি আমাদের সমাজকে খণ্ড খণ্ড করার কাজ করে চলেছে, ধর্মের নামে অধর্ম করে চলেছে। হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তারা শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, দ্রাবিড়ীয়, তপশিলি জাতি, তপশিলী উপজাতি, জনজাতি, অবহেলিত, মহিলা সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে আমাদের বিভক্ত করে পৃথক করার অভিসন্ধি করছে। এভাবে সবাই যদি পৃথক হয়ে যায়, তাহলে হিন্দু-পরিচয়ে কারা থাকবে? এইভাবেই তারা প্রথমে পৃথক করে, তারপর ধর্ম-পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে। স্বামীজী বলেছেন, ধর্ম পরিবর্তন করলে শুধুমাত্র যে একজন হিন্দু কমে যায় তা নয়, হিন্দুদের একজন শত্রু বেড়ে যায়। সেজন্য ওই সকল রাষ্ট্রবিরোধীদের কাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করা, কেউ যাতে নিজেকে অবহেলিত, অবদমিত মনে করে তাদের ফাঁদে পা না দেয়, এজন্য আমরা বিশেষত মহিলারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল গরিব তথাকথিত পিছিয়ে পড়া মানুষজন আছে, তাদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হবো।

আমাদের পূজায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো, প্রসাদ, উপহার ইত্যাদির দ্বারা প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখব। আমাদের ঘরের কাজে যেসব মহিলা সাহায্য করে, তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। বাজার করার সময় আমাদের মানুষদের থেকে কেনাকাটা করা এবং সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা। মহিলারা এই ভাবে ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে সমাজে সমরসতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা করবে। যে সমাজে সমরসতা বজায় থাকে, সেই সমাজ হলো সুস্থ, সবল এবং সুসংগঠিত সমাজ। এইরকম সবল সমাজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সশক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা। □

মায়োপিয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

শরীরে শ্রেষ্ঠ উপহার আমাদের চোখ। সম্পদ বলাই ভালো। যতক্ষণ আমাদের দৃষ্টি নিখুঁত, ততক্ষণ আমরা এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নই। দৃষ্টিশক্তি হারানো সবচেয়ে খারাপ। বর্তমানে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি ডিভাইসের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় দূরের দৃষ্টিশক্তি হারাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। নেদারল্যান্ড ও চীনের সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা জানাচ্ছে, কোভিড-১৯ চলাকালীন মায়োপিয়ার মতো সমস্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। বিশেষ করে ছোটোদের মধ্যে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি। চিকিৎসকরা এর নাম দিয়েছেন ‘কোয়ারেন্টাইন মায়োপিয়া’। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবেন। সর্বনেশে ব্যাপার।

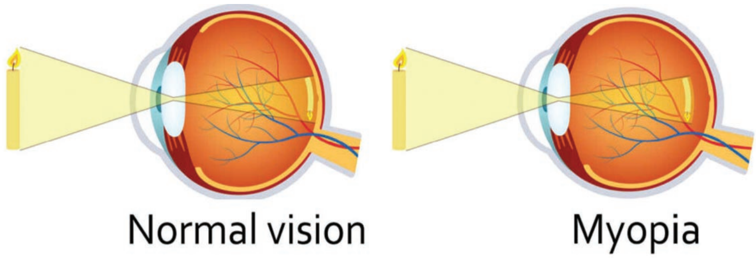

মায়োপিয়া কী?

মায়োপিয়া হলো চোখের ত্রুটি বা চোখের সাধারণ অস্বাভাবিকতা, যেখানে কাছের দৃষ্টি পরিষ্কার থাকে অথচ দূরের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

কী করে বুঝবেন?

● দূরের বস্তুর দিকে তাকালে ঝাপসা দৃষ্টি, কাছের বস্তুর দিকে তাকালে স্পষ্ট দৃষ্টি।

● কম আলোয় জিনিস দেখতে অসুবিধে হয়।

● দীর্ঘক্ষণ পড়া বা যে কোনো স্ক্রিন ব্যবহারের পর চোখের ক্লান্তি ও চাপ, সঙ্গে মাথাব্যাথা।

● অত্যধিক চোখের পলক পড়া ও ঘন ঘন ঘষা।

কী কারণে হয় মায়োপিয়া?

প্রথমত, বংশগত কারণে হয়। মা-বাবার মায়োপিয়া থাকলে এই সমস্যার সম্ভাবনা থেকেই যায়। বর্তমানে যে কারণে এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা দিচ্ছে তা হলো, সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের হাত চলে যায় মোবাইলের দিকে। মিনিট দশ-পনেরো সমাজ মাধ্যমে উঁকি না দিলে অনেকেরই দিন শুরু হয় না। কেবল বড়োদেরই নয়, শিশুদেরও এখন পড়াশোনা চলে অনলাইনে। তাদের ক্ষেত্রেও ‘স্ক্রিন টাইম’ আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। মোবাইল, ল্যাপটপ কিংবা ট্যাব যে কোনও স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে তাদের। বাড়তি স্ক্রিন টাইমের কারণে দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই।

বর্তমানে শিশুরা বাইরে কম সময় কাটানোর ফলে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে দূরে তাকানোর অবকাশ পায় না। সূর্যের আলো আইবলের গ্রোথ ভালো করে। গবেষকরা দেখেছেন সূর্যের আলো রেটিনা থেকে ক্ষরণ হওয়া ডোপামিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এই বাড়তি ডোপামিনই আইবল বড়ো হওয়া বা তার স্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছানো আটকে দেয়। মায়োপিয়া তৈরি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ সেটাই। ছোটো আইবল।

কমানোর উপায়

● স্বাস্থ্যকর ডায়েট।

● প্রতিদিন বাইরে আলট্রাভায়োলেট সুরক্ষা-সহ নিরাপদ জায়গায় কমপক্ষে ১৫-২০ মিনিট প্রাকৃতিক সূর্যালোকে কাটানো।

● শিশুদের হাতে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দেওয়া বন্ধ করতে হবে। চিকিৎসকদের বক্তব্য, তিন বছর পর্যন্ত যে কোনো স্ক্রিন শিশুদের চোখের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। চার থেকে ছয় বছরের শিশুদের দিনে তিরিশ মিনিটের বেশি স্ক্রিনের দিকে তাকানো ঠিক নয়।

● ২০-২০-২০ নিয়ম।

এখন প্রবল টি ২০, যুগ। চোখেরও জন্য রয়েছে কুড়ি— কুড়ি রুল। প্রত্যেক ২০ মিনিট অন্তর মোবাইল, ট্যাব, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কাজ করায় বিরতি নিন। ২০ ফুট দূরত্বে থাকা কোনো অবজেক্ট বা বস্তুর দিকে তাকান। কতক্ষণ তাকাবেন? অন্তত ২০ সেকেন্ড। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করতেও হবে। শিথিল করার জন্য চোখের মণিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং বিপরীতে নড়াচড়া করতে হবে।

● শিশুদের নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা আবশ্যক। এছাড়া প্রয়োজনে চশমা, কন্ট্যাক্ট লেন্স, সংশোধনমূলক চোখের সার্জারি তো আছেই।

কম-বেশি

● কারও দৃষ্টিশক্তি ৬/৬। তার অর্থ, তিনি ৬ মিটার দূর থেকে যা দেখেন, গড় মানুষ ৬ মিটার দূর থেকেও তাই দেখেন। সুতরাং নিখুঁত দৃষ্টিশক্তির মান ৬/৬।

● কারও দৃষ্টিশক্তি ৬/৯ অর্থে, তিনি ৬ মিটার দূর থেকে যা দেখেন, গড় মানুষ ৯ মিটার দূর থেকে তাই দেখেন। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, মানুষটির মৃদু মায়োপিয়া আছে।

● দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা।

মাঝারি : ৬/১৮-এর চেয়ে খারাপ এবং ৬/৬০-এ চেয়ে ভালো।

গুরুতর : ৬/৬০-এর চেয়ে খারাপ এবং ৩/৬০-এর থেকে ভালো।

পর্যায় ৩ অন্ধত্ব : ৩/৬০-এর চেয়ে খারাপ এবং ১/৬-এর চেয়ে ভালো।

পর্যায় ৪ অন্ধত্ব : আলো উপলব্ধি-সহ ১/৬০-এর চেয়ে খারাপ।

মায়োপিয়ার ঝুঁকি এড়াতে সবার আগে ফোন থেকে দূরে থাকাটা ভীষণ জরুরি। বাইরে বেরিয়ে হালকা শরীরচর্চা কিংবা হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। শিশুরা স্কুল থেকে ফিরলে অবশ্যই সন্ধ্যে হওয়ার আগে তাদের মাঠে খেলতে পাঠান। ছুটির দিনে বেশি করে প্রাকৃতিক আলোয় সময় কাটাতে তাদের উৎসাহী করে তুলুন। ◻

স্বামীজীর বজ্রবাণীতে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন নেতাজী

অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী

ভারতমাতার দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। দু'জনেই বীরেশ্বর, মুক্তি পাগল, সর্বত্যাগী, জনগণমন অধিনায়ক। পরাধীন দেশমাতৃকার দৈন্যে দুজনেই পীড়িত। মাতৃভূমির বন্ধনমোচন ও স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্য দু'জনেই সক্রিয়। তবে দু'জনের দুই পথ। স্বামীজী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতি ঘটিয়ে দেশবাসীর জাগরণ ঘটিয়ে যথাযথ প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, উপনিষদের 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত' মন্ত্রে।

আর একজন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দু'জনেই প্রাণশক্তিতে উচ্ছল। একজনের শক্তির উৎস তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। অপর জনের অন্তরে এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির জোগানদার স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। নেতাজীর মাত্র ৫ বছর বয়সে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। স্বামীজী যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন, পুষ্ট হয়েছেন, সেইভাবে নেতাজী কিন্তু গুরু স্বামীজীর সাক্ষাৎ বা সান্নিধ্য পাননি। স্বামীজীর লেখার মাধ্যমে নেতাজী তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁকে গুরুপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। তরুণ সুভাষ মনে মনে সন্ধান করছিলেন এক তেজোদীপ্ত গুরুর, আকস্মিকভাবে তার সন্ধানও তিনি পেয়ে গেলেন।

নেতাজীর কথায়, 'হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমাদের এক আত্মীয় সুহৃদ্ চন্দ্র মিত্র নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি, হঠাৎ নজর পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উলটেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই

নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকে তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— মানব জাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।' স্বামীজীর প্রভাব তরুণ সুভাষের জীবনকে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা তিনি নিজেই সে কথা বলেছেন।

স্বামীজীর বাণীতে অনুপ্রাণিত সুভাষ সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তিনমাসের সাবমেরিন যাত্রায় নির্ভীকভাবে জার্মানি থেকে এসে পৌঁছেছিলেন জাপানে। সেখানে মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন নিজের তৈরি আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব।

সিঙ্গাপুরের রণাঙ্গনে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একান্ত যোগাযোগ ছিল নেতাজীর। এক-একদিন গভীর রাত্রে মিশনের ব্রহ্মচারী কৈলাসকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। ব্রহ্মচারীজী এলে দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন আধ্যাত্মিক বিষয়ে। কোনো কোনোদিন নিজেই চলে যেতেন মিশনে। সিল্কের ধুতি পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে সেখানে বসে থাকতেন, দেখে মনে হতো তিনি যেন নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন ঠাকুরের চরণে। নেতাজীর সংগ্রাম ও কর্মধারার দিশা ছিল স্বামীজীর সেই অমোঘবাণী ---আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন।

এই অমোঘ বাণীর শক্তিতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দখলমুক্ত করেছিল উত্তর পূর্বভারতের একটা অংশ। তারিখটা ছিল ১৯ মার্চ ১৯৪৪ সাল। ঠিক ভোর হবার মুহূর্তে আজাদি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রিটিশ বাহিনীর উপর, প্রায় তুড়ি মেরে দখল করল ইম্ফল-কোহিমা-সহ উত্তর পূর্বভারতের এক বিশাল অঞ্চল। এখানেই প্রথম উড্ডীন হলো স্বাধীন ভারতের পতাকা।

স্বামীজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি কিন্তু তাঁর বাণী মুক্তিকামী সেনাদের সেদিন দেশপ্রেমে পাগল করে দিয়েছিল। ভারতের যুবশক্তিই ছিল স্বামীজীর প্রাণ সর্বস্ব। বলেছিলেন— 'আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক'— চাই আশাপূর্ণ, বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা ও মেধাবী যুবক। এই যুবচেতনা থেকেই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নতুন ভারত গঠনে দেশের যুব সমাজকে ডেকে বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন— 'ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।'

এই বজ্রবাণীতে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামীজী তাঁর অন্তরে জ্বেলে দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

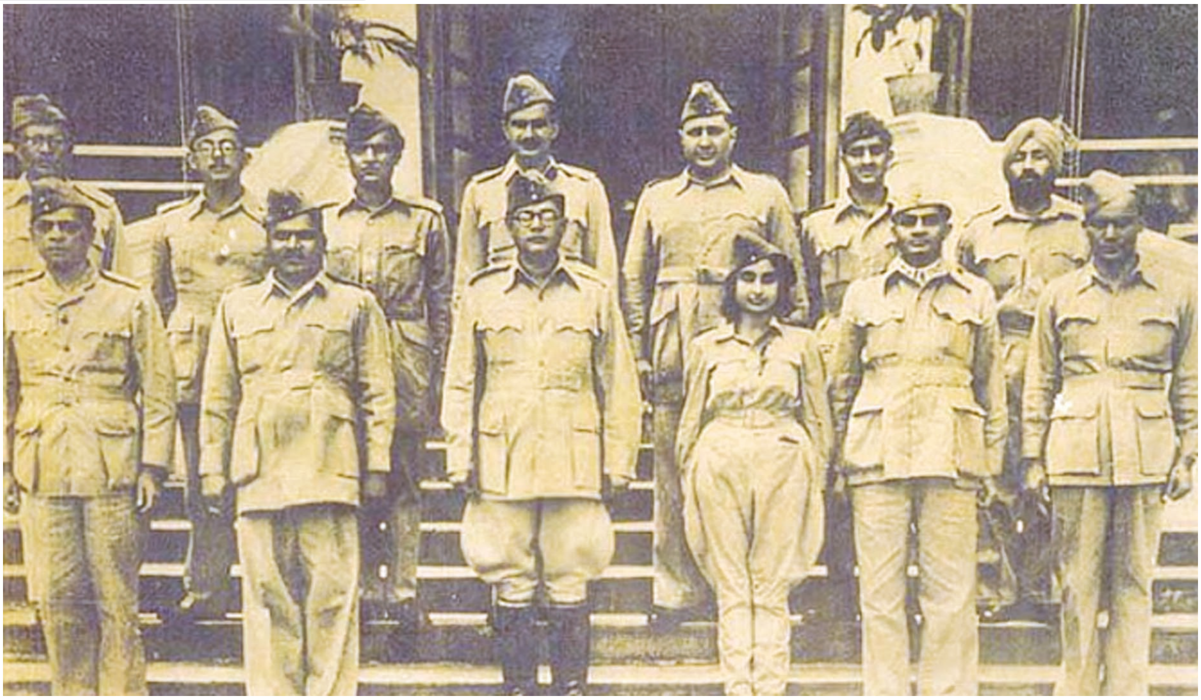

নেতাজীর মৃত্যু রটনার উৎস সন্ধান

ডাঃ মধুসূদন পাল

১৯৪৫-এর ২৩ আগস্ট টোকিয়ো বেতারকেন্দ্র থেকে একটি বেসরকারি সংবাদ সংস্থা 'ডোমেই'-কে উদ্ধৃত করে প্রচার করা হয়েছিল, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫, তাইহোকু বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। তারপরে দেশে-বিদেশে এই সংবাদের পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন তথ্য ও বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। যদিও রহস্য রহস্যই রয়ে গিয়েছে। ভারতে নানা সময়ে এই রহস্যভেদের জন্য অনুসন্ধানের দাবি উঠেছিল, কিন্তু খণ্ডিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু তা করতে রাজি হননি। এমনকী লোকসভায় দাঁড়িয়ে একসময়ে বলেছেন, বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে বিদেশের মাটিতে। তিনি কীভাবে বিদেশে গিয়ে অনুসন্ধান করবেন। কখনো বলেছেন, অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। কারণ, ঘটনাটি সত্য। পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ জনগণ ১৯৫৬-র জানুয়ারি মাসেই সিদ্ধান্ত নেয়, আন্তর্জাতিক আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস রাধাবিনোদ পালকে সভাপতি করে একটি জনগণের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। ভীতসন্ত্রস্ত নেহরু এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই বছরই গঠন করেন শাহনওয়াজ কমিটি। এর সদস্য ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেজদা সুরেশচন্দ্র বসু, একজন আমলা, আইসিএস এসএন মৈত্র, কমিটির সভাপতি শাহনওয়াজ খান। শাহনওয়াজ খান ও এসএন মৈত্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে নেতাজীর। অন্যদিকে সুরেশচন্দ্রের বক্তব্য ছিল এদের ঠিক বিপরীত। উল্লেখ্য, জাপান ও তাইওয়ান সরকার এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে রাজি থাকলেও ভারত সরকার শাহনওয়াজ খান কমিটিকে তথাকথিত ঘটনাস্থলে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি।

বিগত দশকের সত্তরের দশকে অধ্যাপক সমর গুহ-র নেতৃত্বে প্রায় ৩৫০ জন সাংসদ ভারত সরকারের কাছে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে নতুনভাবে অনুসন্ধানের দাবি জানায়। অনেক টালবাহানার পর তৈরি হয় জাস্টিস খোসলা কমিশন (১৯৭০-'৭৪)। এই কমিশন তাইওয়ান গিয়েছিল, কিন্তু অকুস্থল পরিদর্শন এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি দলিলদস্তাবেজ পরীক্ষা করেনি। এই কমিশনেরও রায় ছিল, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। তারপর দেশে ঘোষিত হলো জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-'৭৭)। এরপর নির্বাচন এবং জনতার রায়ে কেন্দ্রে গঠিত হলো জনতা সরকার। সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ২৮ আগস্ট ১৯৭৮, লোকসভায় বক্তব্য রাখলেন, 'শাহনওয়াজ খান কমিটি এবং খোসলা কমিশনের রিপোর্ট— বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে— গ্রহণযোগ্য নয়।'

তারপর কিছু যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সমসাময়িককালে সামনে এসেছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। একইসঙ্গে আগের সাক্ষ্যগুলোর মধ্যেও দেখা যাচ্ছে প্রচুর অসঙ্গতি। এই সন্দেহ, পরস্পর বিরোধিতা এবং নতুন তথ্যের আলোকে পুরনো সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা দেশবাসীর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতার দ্বারা শাহনওয়াজ খান কমিটি এবং খোসলা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল হয়ে যায়। তারপর বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার দুরভিসন্ধিমূলকভাবে নেতাজীকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' প্রদানের ষড়যন্ত্র করে। সামনে ছিল, শ্রদ্ধা দেখানোর অভিনয়, আর পিছনে ছিল নেতাজীর মৃত্যু পরোয়ানা জারির গূঢ় চক্রান্ত। সংবাদটি সামনে আসতেই এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে প্রবুদ্ধ

নাগরিক সমাজ। নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মণি চক্রবর্তী, অধ্যাপক সমর গুহ প্রমুখ। এই প্রেক্ষিতে কলকাতা উচ্চ আদালতে (হাইকোর্টে) ভারত সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন অ্যাডভোকেট বিজন ঘোষ (রিট পিটিশন নং ৮৩৪ অফ ১৯৯৫)। পরে এই মামলায় যুক্ত হন নেতাজী অনুগামী সুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত, অধ্যাপক সমর গুহ, অ্যাডভোকেট রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। ভয় পেয়ে ভারত সরকার এই মামলা নিয়ে যায় সুপ্রিম কোর্টে। বুদ্ধিজীবীদের হয়ে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ফলি নরিম্যান। ১৯৯৭ সালে এর বিচার শেষ হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয় 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' প্রদানের ষড়যন্ত্র। কারণ, ভারত সরকার কোর্টে নেতাজীর মৃত্যুর সপক্ষে একটাও তথ্য দিতে পারেনি।

১৯৯৮ সালে অ্যাডভোকেট রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্যকে সামনে রেখে সুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত এবং তাঁর সহযোগীরা কলকাতা হাইকোর্টে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থ মামলা (পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন) দায়ের করেন। মামলাকারীদের মূল দাবি, নেতাজীর বিরুদ্ধে জারি রাখা 'যুদ্ধ অপরাধী' তকমা বাতিল করা এবং নেতাজী রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নতুন তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দান। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রভাশঙ্কর মিশ্র এবং বিচারপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের বেঞ্চ রায় দেয় যে, এবিষয়ে নতুন ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। এই রায় প্রকাশিত হয় A.I.R. 1999 CALCUTTA (Page-9) পুস্তকে। এর ফলে হয়, এন.ডি.এ সরকার দ্বারা জাস্টিস মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন গঠন (১৯৯৯-২০০৫)। কমিশনের রায় প্রকাশিত হলো ২০০৫-এ। বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত, (১) ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি। (২) জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রাখা ভস্ম নেতাজীর নয়। (৩) পরবর্তীকালে কোথায়, কীভাবে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে, সে সম্পর্কিত কোনো তথ্য-প্রমাণ কমিশনের কাছে নেই।

এই রিপোর্ট সম্পর্কে দেশের মানুষ কতটা অবগত, তা এই লেখকের অজানা। ভয়ংকর, চরম, অথচ মধুর সত্য হলো, এই রিপোর্ট নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভায় কোনো আলোচনা বা বিতর্ক হয়নি, কিংবা কোনো ভোটাভুটি হয়নি। ইউপিএ-১ সরকারের আমলে সংসদের দুই কক্ষেই কোনো আলোচনা ছাড়াই রিপোর্টটি খারিজ করা হয়।

জাপান সরকার নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারে নিজে কোনো দায়িত্ব নেয়নি। সংবাদের খসড়া করেছিলেন আইয়ার, যিনি নিজেই এই ঘটনা বিশ্বাস করেন না।

প্রশ্ন, তাহলে বিমান দুর্ঘনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদের উৎস কোথায়? এবার আমাদের যেতে হবে মূলের সন্ধানে।

সূত্র, এসএআইয়ারের গ্রন্থ— 'UNTO HIM A WITNESS : THE STORY OF NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE IN EAST ASIA (Thacker & Co Ltd., Bombay, 1951)'। বইটির লেখক এসএ আইয়ার ছিলেন, আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী। এই গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, ২০ আগস্ট ১৯৪৫, জাপানি সামরিক অফিসাররা এসএ আইয়ারকে সায়গন (ভিয়েতনাম) থেকে বিমানে তুলে নেন (পৃ. ৭৯)। বিকাল ৫টায় বিমান পৌঁছায় চীনের ক্যান্টনে। সায়গনেই রিয়ার অ্যাডমিরাল চুডা (Rear-Admiral Chuda) আইয়ারকে বিমান দুর্ঘটনার কথা জানান। কিন্তু আইয়ারের মনে হয়েছিল, এটি একটি তৈরি কাহিনি (পৃ. ৮৩)। কর্নেল টি (Colonel-T) এখানে আইয়ারকে বিমান দুর্ঘটনার কাহিনি শোনান। আইয়ার নেতাজীর মৃতদেহ দেখতে চান। কর্নেলের উত্তর ছিল, 'I shall do my best' (পৃ. ৮৫)। কিন্তু আইয়ারকে তাইওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বিমান ক্যান্টন থেকে তাইচু হয়ে জাপানে পৌঁছে যায়। বিস্মিত আইয়ার প্রচণ্ড রেগে যান (পৃ. ৮৫-৮৭)। আইয়ার তাঁর গ্রন্থে এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'সম্ভবত পুরো কাহিনি মিথ্যা। তাইহোকুতে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। আমাকে জাপানিরা তাইহোকুতে নিয়ে গেল না কেন? গল্প অনুযায়ী, হাবিবও দুর্ঘটনায় পড়েছিল। তাঁর মৃত্যু হলে নেতাজীর মৃত্যুর তো কোনো সাক্ষীই থাকত না। (পৃ. ৮৭)

আমি আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী। কোনো কিছু না দেখে আমি কী করে ধরে নেব, বিমান দুর্ঘটনা হয়েছিল? (পৃ. ৮৮)। আপনারা কি নেতাজীর মৃতদেহ টোকিয়ো কিংবা সিঙ্গাপুরে আনার চেষ্টা করেছেন? জাপানিদের উত্তর, তাইহোকুর কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তাইহোকু পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন।' (পৃ. ৯০)

১৮ আগস্টের পরবর্তী পর্যায়ে আইয়ার তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এই বইতে লেখেন যে, '২২ তারিখ হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত কী জাপান সরকার কিংবা আজাদ-হিন্দ সরকার নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে একটা কথাও প্রচার করেনি। পুরো চারদিন হয়ে গেছে। আরও দেরি হলে পৃথিবীর কেউ এটা বিশ্বাস করবে না।' জাপানিরা চাইল, আইয়ারকে দিয়ে সংবাদের খসড়া তৈরি করাতে। আইয়ার লিখেছেন যে, 'Then they wanted me to draft the announcement. I dictated a draft and asked them to show me the final draft before announcing it.' পরে এই খসড়া আইয়ারকে না দেখিয়েই টোকিয়ো রেডিয়ো বেসরকারি সংবাদ সংস্থা ডোমেই-এর নাম দিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রচার করে। ডোমেই নিউজ এজেন্সির দ্বারা এই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়।

১৮.১০.১৯৭২-এ বোম্বেতে আইয়ার জাস্টিস খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'The actual news about Netaji's death was drafted with my assistance' (খোসলা কমিশন এভিডেন্স, পৃ. ৪০৮৯)

সংক্ষেপে এ ব্যাপারে বলা যায়, জাপান সরকার নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারে নিজে কোনো দায়িত্ব নেয়নি। সংবাদের খসড়া করেছিলেন আইয়ার, যিনি নিজেই এই ঘটনা বিশ্বাস করেন না।

উপসংহারে এ কথাই বলা যায় যে, ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এ তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা আদপে হয়নি। নেতাজী সেই সময়ে তাইহোকুতেই যাননি। তারপর নেতাজীর রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন ও ভিয়েতনামে অবস্থানের প্রামাণ্য তথ্য রয়েছে। ভারতেও তিনি অবস্থান করেছেন ১৯৮৫ পর্যন্ত। সংবাদটি ভারত সরকারের কাছেও ছিল। পরবর্তী ঘটনা রহস্যজনক। আগামীদিনে তা প্রকাশিতব্য।

(লেখক একজন নেতাজী গবেষক)

ওঙ্কারেশ্বরে কুটুম্ব প্রবোধনের অখিল ভারতীয় বৈঠক

গত ৪-৫ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশের মালবা প্রান্তের শৈবতীর্থ ওঙ্কারেশ্বর অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গতিবিধি কুটুম্ব প্রবোধনের অখিল ভারতীয় বৈঠক। বৈঠকে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত, পূর্বতন সরকার্যবাহ তথা কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির সম্পর্ক অধিকারী সুরেশ (ভাইয়াজী) জোশী, কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির অখিল ভারতীয় সংযোজক রবীন্দ্র জোশী উপস্থিত ছিলেন। সারা ভারতের ৪৫টি প্রান্তের প্রতিনিধি উপস্থিত হন। ৫০ জন প্রান্ত সংযোজক, সহ-সংযোজক সপত্নীক বৈঠকে উপস্থিত হন। ১১টি গটে গতিবিধির বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা হয়।

'সমর্থ কুটুম্ব ব্যবস্থা' বিষয়ক বক্তব্যে সরসঙ্ঘচালকজী বলেন, 'পরিবার তখনই সমর্থ পরিবার হবে যে পরিবারে যে কোনো সমস্যা ভালোবাসা দিয়ে, সহানুভূতির সঙ্গে সমাধান করতে হবে। পরিবারের বড়োদের বিশেষ করে বাবা-মা'র আচরণ, চরিত্র কেমন হবে তার প্রভাব ছোটোদের উপর পড়ে। পরিবারে ভালোবাসার শাসন থাকলে পরিবার সুস্থ ও সমর্থ হয়। শিশুদের শৈশব, বাল্য, কৈশোরকালকে তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে দিতে হবে, শুধুমাত্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর জন্য বাকি দিকগুলোকে অবহেলা করলে চলবে না।'

শ্রীভাগবত নর্মদাতটে ওঙ্কারেশ্বরের মার্কণ্ডেয় আশ্রমে ভারতমাতা ও আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তি পূজন করেন । পূজনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ভারতের মৃত্তিকা আমাদের পালন-পোষণ, সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করে। ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক মানুষের সেবা এক স্বাভাবিক সংস্কার। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পূজন মানে ভারতের জন, জমি, জঙ্গল, জল, জানোয়ারের সেবা ও সুরক্ষা প্রদান করা। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ তথা সংবর্ধনের কাজ ভারতমাতার পূজন থেকে প্রাপ্ত প্রেরণার প্রকাশ।' নর্মদামাতার আরতির পর তিনি একান্তে সাধনা এবং লোকান্তে সমাজ সেবার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, 'যারা যে অবস্থায় থাকুন না কেন সমাজসেবার জন্য তৎপর থাকতে হবে।

যেভাবে গরুড় মায়ের সেবা করে বিষ্ণুর বাহন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে, সেভাবেই ভারতমাতার সেবা করে আমরা ধর্মের বাহক হওয়ার জন্য সমর্থ হই।' তিনি পরিবারে ভারতীয় ভাবধারায় ছ'টি 'ভ'-এর ব্যবহার করতে আহ্বান জানান। ভাষা, ভূষা, ভজন, ভোজন, ভবন ও ভ্রমণ এই ছ'টি বিষয়ে নিজ নিজ পরিবারে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভাববার কথা বলেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে নাগরিক সভা

বাংলাদেশে হিন্দুহত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, হিন্দুদের সম্পত্তি ভাঙচুর, লুণ্ঠতরাজ এবং বলপূর্বক ধর্মান্তরণের প্রতিবাদে বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসঙ্ঘ, হিন্দু মিশন ট্রাস্ট ও হিন্দু মহাসভার যৌথ উদ্যোগে গত ৪ জানুয়ারি কলকাতার কলেজ স্ট্রিট-স্থিত ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাঘরে আয়োজিত হয় একটি বিশেষ নাগরিক সভা। এই সভায় সভাপতি ছিলেন স্বামী আগমানন্দজী মহারাজ। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন সুমন্ত চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ নাগরিক পরিসঙ্ঘের পক্ষে বিশ্বজিৎ বসু এবং হিন্দু মিশন, দক্ষিণবঙ্গের পক্ষে রাধাকান্ত গড়াই। পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ইত্যাদি জেলা থেকে বহু মানুষ এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' এবং 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গান দু'টি বিশ্বজিৎ বসু ও বুলু কর্মকারের দ্বৈত কণ্ঠে সভায়পরিবেশিত হয়। সভায় বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন স্বামী আগমানন্দজী মহারাজ ও সুমন্ত চক্রবর্তী। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ সভা সমাপ্ত হয়।

কলকাতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক পরিবার মিলন অনুষ্ঠান

গত ৪-৫ জানুয়ারি কলকাতা বড়বাজারস্থিত বিনানী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো প্রচারক পরিবার মিলন অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৮৯ জন প্রচারকের পরিবারের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে মিলিত হন। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট ও ত্রিপুরা থেকে আসা প্রচারকদের পরিবারের সদস্যরাও মিলিত হন। সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৩০৫ জন।

৪ জানুয়ারি সকাল ১১ টায় ভবনের সভাগৃহে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলে সমবেত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত ও সুনীলপদ গোস্বামী । প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতা, ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর সমবেত কণ্ঠে গীত হয় 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা'।

রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘ এবং কল্যাণ আশ্রম ও সেবিকা সমিতির দিদি-বোনেরা আগত প্রচারক ও পরিবারের সদস্যদের পুষ্পবর্ষণ করে বরণ করে নেন, সঙ্গে ধ্বনিত হয় বেদ মন্ত্র, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি। তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয় দক্ষিণবঙ্গের বর্তমান প্রচারক ও পরিবারের সদস্যদের পরিচয়। এর পরে সকলে সম্মিলিত হন সহভোজের আসরে। স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের মা-বোনেরাই পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করেন।

ভোজন পরবর্তী সত্রে ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল এবং প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট চিত্র-ভাষ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন ১৯৩৯ সাল থেকে যে সমস্ত প্রচারকদের অবদানের কারণে দক্ষিণবঙ্গে সঙ্ঘ ও বিবিধ ক্ষেত্রের কাজ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিস্থাপিত করে গেছেন। তাঁদের সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতিতে দেশবিভাজনের বিভীষিকার কালে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের উদ্ধার, উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ঘটনা হোক বা জরুরিকালীন অবস্থা বা বাম আক্রমণের মুখাপেক্ষী হওয়া বা আর্থিক দৈন্যদশার মধ্যেও সঙ্ঘকাজকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছে দেওয়ার কাজের বর্ণনা উপস্থাপন করেন। পুরনো প্রচারকদের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেককেই আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়, যাদের পরিবারের সঙ্গে সেই সব প্রচারক যেন আপন আত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। নতুন প্রজন্মের অনেকেই অবাক দৃষ্টিতে দেখে কত প্রচারক সেসময়কার বড়ো বড়ো ডিগ্রি অর্জন করে, কেউ কেউ চাকরি ছেড়ে, কেউ-বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ট্রেন-বাস আর পায়ে হেঁটেই বঙ্গপ্রদেশের প্রতিটি জেলায় সঙ্ঘকাজের বিস্তার করেন। বহু প্রচারক মহারাষ্ট্র থেকে এসে পুরোদস্তুর বাঙ্গালি হয়ে গেছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বঙ্গভূমিকেই শেষ ঠিকানা করে নেন। ঠিক তেমনি দক্ষিণবঙ্গ থেকেও বহু প্রচারক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছেন তারও উল্লেখ হয়।

তৃতীয় সত্রে অনুভব কথনে প্রচারক পরিবারের সদস্যরা তাঁদের মনের কথা তুলে ধরেন। পরিবারের একজন প্রচারক রূপে সমাজের কাজে সময়দান প্রাথমিক পর্যায়ে বেদনাদায়ক হলেও তা যে পরিবারের কাছে অত্যন্ত গর্বের তা অধিকাংশ বক্তব্যেই উঠে আসে।

চতুর্থ সত্রে প্রান্ত সঙ্ঘচালক অনুষ্ঠানে সহযোগিতাকারী ও অংশগ্রহণকারী সকলকেই নিজের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এরপর সহসরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন। সঙ্ঘ প্রার্থনার পর নৈশভোজে সকলে সম্মিলিত হন।

৫ জানুয়ারি সকলে ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজা এবং বেলুড় মঠ দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। দুপুরে বেলুড় মঠেই প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। শেষে সঙ্ঘ কার্যালয় কেশব ভবনে চা স্বল্পাহার সেরে সবাই নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করেন।

ফ ঃ ৪

বাঁকুড়ায় কর্মযোগীর বার্ষিক সম্মেলন

গত ৭ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলার বাঁকদহে অনুষ্ঠিত হয় কর্মযোগীর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সহ সরকার্যবাহিকা সুনীতা হলদেকর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এলাকার ১০টি শিশু সংস্কার কেন্দ্র থেকে ১৬০ জন শিশু ব্যায়ামযোগ ও যোগাসন প্রদর্শন করে। সংস্থার পক্ষ থেকে ৫০ জন গরিব মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়। সম্মেলনে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, বারাসাত, ব্যারাকপুর, কলকাতা, হাওড়া থেকে শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করে।

সুনীতা দিদি বঙ্গপ্রদেশের ঐতিহ্য, পশ্চিমবঙ্গে মাতৃজাতির সুরক্ষা, ভগিনী নিবেদিতার হিন্দুত্ববোধ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মাধ্যমে হিন্দু জাতির স্বাভিমান পুনরুদ্ধারের কথা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

সিউড়ীতে শ্রদ্ধার বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন

গত ৫ জানুয়ারি সিউড়ী অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনষ্ঠিত হলো শ্রদ্ধার চতুর্দশ বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন। সংস্থার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু ব্রহ্মনাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা, সম্পাদক দামোদর ঘোষাল এবং সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। ভারতমাতা, ওঙ্কার ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার পর সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, সুব্রত নন্দন, সুদীপ্ত ঘোষ, কাকলি দাস, পল্লব বৈরাগ্য।

বক্তব্য রাখেন মিলন চট্টোপাধ্যায়, আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহাদেব চন্দ্র, বিশ্বনাথ দে । প্রতিবেদনে জানা যায়, ১৬ বছর আগে শিক্ষক স্বর্গীয় নিরঞ্জন হালদার, দেশসেবক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও সমাজসেবী লক্ষ্মণ বিষ্ণু এই সংস্থা গড়ে তোলেন। ২০০৮ থেকে বর্তমান সময়াবধি মোট ১৫৬ জনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলা জজ বিপিন মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র-সহ শতাধিক অনুভবী ব্যক্তি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক তথা সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ জীব-বৈচিত্র্য পর্ষদের পরিবেশ দপ্তরের সহযোগিতায় দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের নিয়ে গত ২৮ ডিসেম্বর স্থানীয় নাগরাকাটা অঞ্চলের শুল্কাপাড়া ফরেস্ট রেঞ্জে আয়োজন করা হয় এক দিবসীয় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির। ৪০ জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন তাদের পরিবার পরিজন-সহ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিলাদিত্য মিশ্র জলপাইগুড়ি শহর থেকে বেলুন উড়িয়ে যাত্রা শুরু করান। শুল্কাপাড়া বিট অফিসে সক্ষমের সশক্তিকরণ দিবস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন প্রান্ত সম্পাদক তনয় দাস। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল। এরপরে ফরেস্টের দায়িত্বশীল আধিকারিকরা দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের নিয়ে বনাঞ্চল ভ্রমণ করেন এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করান। মধ্যাহ্নভোজনের আগে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। শিবির পরিচালনা করেন সক্ষমের জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ। তাঁকে সহযোগিতা করেন কোষাধ্যক্ষ রাজেশ আগরওয়াল, প্রদীপ গুহ এবং মহিলা আয়াম প্রমুখ শ্রীমতী লিপিকা দাস।

কসবা রাজডাঙ্গা নারকেল বাগান মাঠে শ্রীগীতাজয়ন্তী উদ্‌যাপন

শ্রীগীতা জয়ন্তী উৎসব কমিটির উদ্যোগে কলকাতার রাজডাঙ্গা নারকেল বাগান মাঠে গত ২৮-২৯ ডিসেম্বর শ্রীগীতা জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়। এলাকার ৭৫টিরও বেশি মঠ-মন্দিরের প্রতিনিধিত্ব হয় অনুষ্ঠানে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন।

গীতাপাঠ, ধর্মীয় আলোচনা সভা, বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন, আলপনা প্রতিযোগিতা, শ্রীকৃষ্ণলীলা আধারিত নৃত্য-গীত, ভজন সংকীর্তন, গীতা ও মহাভারত সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

চক্রধারী কেশব-সহ গৃহপূজিত গোপাল এবং বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বজ, রাজডাঙ্গার জোনামন্দিরে একত্রীকরণ, নগর সংকীর্তন, বিশ্বশান্তিযজ্ঞ, সম্পূর্ণ গীতাপাঠ, অন্নভোগ নিবেদন ও আরতি সংকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। শিশু, বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

প্রণব কন্যা সঙ্ঘের ত্রিশূলোৎসব

গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বারাসাতস্থিত প্রণব কন্যা সঙ্ঘে ৫৫তম ত্রিশূলোৎসব ও ধর্মসংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মঙ্গল আরতি, ভোগারতি, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, শিক্ষা সম্মেলন, মাতৃ সম্মেলন, লাঠিখেলা, অন্নকূট ভোগ ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয়। প্রণব কন্যা সঙ্ঘের অধ্যক্ষা সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মাতাজী হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের হিন্দু সমাজের প্রতি বার্তাকে মনে করিয়ে দেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুদের জন্য পাকিস্তানের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনার কথাও তিনি বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরেন।

চাঁচলে সামাজিক সমরসতা মঞ্চের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ৫ জানুয়ারি উত্তর মালদা জেলার সামাজিক সমরসতা মঞ্চের উদ্যোগে চাঁচল রাজ ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ। দীপ প্রজ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদানের মাধ্যমে বর্গের শুভারম্ভ হয়। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সমরসতা সংযোজক দিলীপ ভকত, সহ বিভাগ সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়, জেলা সংযোজক তারাপদ মণ্ডল-সহ মোট ৩২ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক সমরসতা এবং রানি অহল্যাবাঈ হোলকরের জীবনীর উপর বক্তব্যের পর সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে চর্চা-আলোচনা হয়। সমরসতা মন্ত্রের মাধ্যমে বর্গের সমাপ্তি হয়।

বনগাঁয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিশ্বশান্তি যজ্ঞ ও ধর্মসভা

গত ৭ জানুয়ারি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ বনগাঁ শাখার পক্ষ থেকে বনগাঁ পোস্ট অফিসের পাশে আশ্রমের নিজস্ব ভবনে বিশ্বশান্তি যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। স্বামী অঙ্গিরানন্দজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে সমস্ত প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় মানুষজন অনুষ্ঠানে সম্মিলিত হন। পূজার পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

লোকপ্রজ্ঞা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক যোজনা বৈঠক

গত ৫ জানুয়ারি লোকপ্রজ্ঞা দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক যোজনা বৈঠক হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণব শিক্ষা নিকেতনে সম্পন্ন হলো। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের তিনটি গট থেকে ৩৩ জন কার্যকর্তা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন চর্চাকেন্দ্রে সংযোজকরা নিজের নিজের চর্চাকেন্দ্রের কার্যস্থিতি (সদস্য সংখ্যা), নিয়মিত চর্চার দিন, সময়, স্থান, গড় উপস্থিতি, বনভোজন, বিজয়া সম্মেলন, বিশেষ কার্যক্রম, সদস্যদের ১০বিন্দু তালিকা, পরিবার পত্রক প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করেন প্রান্ত সংযোজক গোপাল বিশ্বাস। চর্চাকেন্দ্রে দ্রুত বনভোজন সম্পন্ন করা, সরস্বতী দক্ষিণা এবং চর্চাকেন্দ্রে নিয়মিত চর্চার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

লোকপ্রজ্ঞা ছাত্রশক্তি প্রমুখ শশাঙ্ক নায়েক, সমাজবিজ্ঞান প্রমুখ ড. অনিল ঘোষ, বিজ্ঞান বিভাগের রাজ্য সহায়তা সমিতির সদস্য নন্দলাল জানা প্রত্যেকে নিজ নিজ বিভাগের প্রতিবেদন পেশ করেন। এরপর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ সংযোজক মহেন্দ্রনারায়ণ দাস এবং রাজ্য সমিতির সদস্য তাপস সরকার তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ উপস্থাপন করেন। বিগত বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম এবং চলতি বছরের আগামী কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা হয়। শেষে রাজ্য সংযোজক ড. সোমশুভ্র গুপ্তের সমাপ্তি ভাষণের পর বৈঠকের সমাপ্তি হয়।

দেশ-বিদেশে কৃষ্ণনাম প্রচারে অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

কানু রঞ্জন দেবনাথ

প্রভুপাদের ছেলেবেলার মাতা-পিতা প্রদত্ত নাম হলো অভয়চরণ দে। তিনি শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পরের দিন ১৮৯৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর কলকাতাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গৌর মোহন দে এবং মাতার নাম রজনী দে। যেহেতু তিনি জন্মাষ্টমীর পরের দিন জন্মেছিলেন, তাই তাঁর মাতা-পিতা তাঁর নাম অভয়চরণ রেখেছিলেন। অভয় মানে যিনি নির্ভীক বা যার ভয় নেই। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে অভয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা একজন জ্যোতিষীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অভয়ের ঠিকুজী লেখার জন্য। সেই জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্ বাণী করেছিলেন যে সত্তর বছর বয়সে অভয় সাগর পাড়ি দেবেন, একজন ধর্মীয় শিক্ষক হবেন এবং সারা বিশ্বে ১০৮টি মন্দির খুলবেন। সেই সময় আমেরিকা যাওয়াকেই সাধারণত সাগর পাড়ি দেওয়া বুঝাত। অভয়ের পিতা-মাতা ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত যে শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ ভালোবাসাই হলো সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

অভয় ছোটোবেলা থেকেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। পাশের বাড়ির একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে প্রতিদিন তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে বা বাড়ির কারও সঙ্গে মন্দিরের সেবায় যোগ দিতেন। ছয় বছর বয়সে অভয় ওড়িশার পুরীতে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৬ সালে স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি খ্রিস্টানের স্কটিশচার্চ কলেজে পড়াশোনা করলেও তার মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পড়ে থাকতো। ১৯১৮ সালে তিনি বিবাহ করেন এবং পাঁচ সন্তানের পিতা হন। কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর তিনি বর্তমান প্রয়াগরাজে একটি নিজস্ব ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি খুলেছিলেন।

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে যুবককালে অভয় অন্যান্য যুবকের মতো গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে কলেজ থেকে ইংরেজি, দর্শন ও অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তিনি সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

মধ্যবর্তী জীবন (১৯২২-১৯৬৫) : ১৯২২ সালে কলেজে ছাত্রাবস্থায় অভয়ের সঙ্গে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর পরিচয় হয়, যিনি একজন বৈষ্ণব পণ্ডিত, শিক্ষক ও গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে কোনো একটি ধর্ম বা জাতির জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য সর্বোচ্চ রূপ বলে মনে করতেন। এই সময় ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বামী ধর্মসভায় অভয়কে বললেন, 'তুমি একজন শিক্ষিত যুবক। তুমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী ইংরেজিতে ছড়িয়ে দাও না কেন?' ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে অভয় শ্রীচৈতন্যের বার্তা ইংরেজিতে ছড়িয়ে দেবার নির্দেশ মেনে নেন এবং এই আদেশ অনুসরণ করেই তিনি পরবর্তী সময়ে আমেরিকায় যান।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে তিনি সেইসময় আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, হৃদয়ে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি দীক্ষা না নিলেও মনে মনে গুরু রূপে মেনে নিয়েছিলেন।

গৌড়ীয় মঠ ও দীক্ষা : ১৯২২ সালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করার পর ১৯২৮ সাল পর্যন্ত অভয়ের গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে খুব কমই যোগাযোগ ছিল। যখন মঠ থেকে সন্ন্যাসী এলাহাবাদে একটি কেন্দ্র খোলেন, তখন অভয়ও এলাহাবাদেই ছিলেন। এই সুবাদে সরস্বতী ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে এলে অভয় তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু কর্তৃক তাঁকে 'অভয়চরণাবিন্দ' নাম দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে গুরু তাঁকে বলেন, 'যদি তুমি কখনো টাকা পাও, তাহলে বই ছাপবে।' এটি একটি নির্দেশ যা তার জীবনের কাজকে অবহিত করবে। ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারি মৃত্যুর দু' সপ্তাহ আগে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী অভয়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যাতে অভয় ইংরেজিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত মানুষের মধ্যে প্রচার করেন।

ভক্তিবেদান্ত শিরোনাম (১৯৩৯) : ১৯৩৯ সালে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবীণরা অভয়চরণারবিন্দকে ভক্তিবেদান্ত উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেন। 'ভক্তি' মানে 'ভক্তি' এবং 'বেদান্ত' মানে 'বৈদিক জ্ঞানের চূড়ান্ত'। এইভাবে সম্মানসূচক উপাধিটি তার পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার স্বীকৃতিই দেয়।

গডহেড ম্যাগাজিনে ফিরে যান (১৯৪৪) : গুরুর আদেশ পুরণের প্রয়াসে ১৯৪৪ সালে এসি ভক্তিবেদান্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা উপস্থাপন করে একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা 'ব্যাক টু গডহেড' প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি এককভাবে পত্রিকাটি লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন, অর্থায়ন করেছেন, প্রকাশ করেছেন এবং বিতরণ করেছেন, যা এখনও তার অনুসারীদের দ্বারা প্রকাশিত ও বিতরণ করা হয়।

বানপ্রস্থ গ্রহণ : ১৯৫০ সালে অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত বানপ্রস্থ আশ্রম (জীবনের ঐতিহ্যগত অবসরের আদেশ) গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনে বসবাস করতে থাকেন, যাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান হিসেবে জানি। যদিও তিনি মাঝে মাঝে দিল্লিতে যেতেন। বৃন্দাবনের পার্শ্ববর্তী স্থান মথুরাতে তাঁর ভ্রাতা কেশব দ্বারা প্রকাশিত গৌড়ীয় পত্রিকার জন্য লেখেন এবং সম্পাদনা করেন।

'ভক্তদের লিগ' গঠন : ১৯৫২ সালে এসি ভক্তিবেদান্ত ঝাঁসিতে সংগঠিত আধ্যাত্মিক কার্যক্রম শুরু করার চেষ্টা করেছিলেন, যেখানে তিনি ভক্তদের লিগ শুরু করেছিলেন, শুধুমাত্র দু' বছর পরে এই সংগঠনের পতন দেখতে পান।

সন্ন্যাস গ্রহণ (১৯৫৯) : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাস গ্রহণের আগে তাঁর নাম 'এসি ভক্তিবেদান্ত' হয়েছিল।

রাধা দামোদর মন্দিরে অবস্থান (১৯৬২-১৯৬৫) : ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভক্তিবেদান্ত স্বামী রাধা দামোদর মন্দিরে (বৃন্দাবনে) অবস্থান করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার কাজ শুরু করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ শ্রীমদ-ভাগবতম (ভাগবত পূরাণ) ভাষা ও তাৎপর্য-সহ ১৮ হাজার শ্লোকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। প্রচণ্ড প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মাধ্যমে অবশেষে তিনি তিনটি খণ্ডে অনুবাদ, উৎপাদন, তহবিল সংগ্রহ ও মুদ্রণ করতে সফল হন ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা (১৯৬৫) : সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভক্তিবেদান্ত স্বামী পশ্চিমে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে দেবার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর ইচ্ছা পূরণ করতে আমেরিকা ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন। আমেরিকা যেতে তাঁকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমেরিকায় তাঁর স্পনসর, ভারতে সরকারি অনুমোদন এবং তাঁর ভ্রমণের জন্য একটি টিকিটের প্রয়োজন ছিল। অনেক অসুবিধার পরে তিনি প্রয়োজনীয় স্পনসরশিপ ও অনুমোদন পেয়েছিলেন। তিনি এক মালবাহী কার্গো জাহাজে করে আমেরিকা যাবার একটি টিকিট বিনামূল্যে পান। তিনি ১৯৬৫ সালের ১৩ আগস্ট ৬৯ বছর বয়সে আমেরিকায় ৩৫ দিনের যাত্রা শুরু করেন। আমেরিকা যাবার সময় তাঁর সঙ্গে একটি স্যুটকেস, একটি ছাতা, কিছু শুকনো খাদ্য, চল্লিশ ভারতীয় রুপি (প্রায় সাত মার্কিন ডলার) এবং শ্রীমদভাবগবতমের প্রথম খণ্ড অনুবাদের দুইশো তিন খণ্ডের সেট নিয়েছিলেন। সমুদ্র যাত্রার সময় দুটি হার্ট অ্যাটাক থেকে বেঁচে থাকার পর ভক্তিবেদান্ত স্বামী অবশেষে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে বোস্টন হারবারে পৌঁছান এবং তারপরে নিউইয়র্ক সিটিতে চলে যান।

নিউইয়র্কে পৌঁছে তিনি একটি বাসে পেনিসিলভেনিয়ার রাজ্যের বাটলার শহরে চলে যান, যেখানে তার পরিচিত আগরওয়ালারা বাস করতেন। বাটলারে থাকাকালীন তিনি কিছু জায়গায় বক্তৃতা দেন। বাটলারে একমাস থাকার পর তিনি আবার নিউইয়র্ক সিটিতে ফিরে আসেন। তিনি আমেরিকায় কাউকে চিনতেন না। সেখানে তিনি অনেক কষ্টে জীবনযাপন করেন। কখনো তিনি এমন ঘরেও থাকতেন, যে ঘরে কোনো জানালা ছিল না। সেখানে প্রথম তিনি হিপ্পি সম্প্রদায়ের কিছু যুবক-যুবতীকে কৃষ্ণনামে দীক্ষা দেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের চারটি নীতি অনুসরণ করার শপথ দিতেন। নিউইয়র্কে প্রথম বছরে তিনি ১৯ জনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ইসকন স্থাপন : ১৯৬৬ সালে জুলাই মাসে তিনি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস (ইসকন) স্থাপন করেন। ভক্তিবেদান্ত স্বামী ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রথম অনুসারীদের শ্রীকৃষ্ণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে, শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করার জন্য খাবার প্রস্তুত করতে, দান সংগ্রহ করতে এবং রাস্তায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র (হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) প্রচার করতে শুরু করেন।

ইসকনের চারটি মূল নীতি : আধ্যাত্মিক দীক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রভুপাদ তাঁর অনুসারীদের বা ইসকনের সদস্য হতে গেলে চারটি মূল নীতি গ্রহণ করার শপথ নিতে বলতেন— ১. অবৈধ যৌনতা নয় (অর্থাৎ বিবাহের বাইরে কোনো যৌনতা নয়), ২. মাংস, মাছ বা ডিম খাওয়া নয়, ৩. কোনো নেশাদ্রব্য নয় (মাদক, অ্যালকোহল, সিগারেট এবং এমনকী কফি ও চা-ও খাওয়া নয়) এবং ৪. কোনো জুয়া খেলা নয়। এছাড়া, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের ষোলটি ধ্যানমূলক বৃত্তাকার জপ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হতো অর্থাৎ ১০৮ পুঁতির মালার মন্ত্র জপের ষোলোটি পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি।

১৯৬৭ সালে শেষের দিকে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর অনুগামীরা সান ফ্রান্সিসকো শহরে পুরীর জগন্নাথ 'রথযাত্রা'র প্রথম রথযাত্রার অনুকরণে আয়োজন করেন।

প্রথমে ভক্তিবেদান্ত স্বামীর অনুগামীরা তাঁকে স্বামী বা স্বামীজী বলে উল্লেখ করতেন। ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি থেকে তারা তাঁকে প্রভুপাদ বলে ডাকতো। তিনি ১৯৭০ সালে আফ্রিকার কেনিয়া সফরে যান। ১৯৭০ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে আমেরিকান সদর দপ্তর এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে ইসকনের অনুগামীরা তাঁকে স্বামী বা স্বামীজী বলে উল্লেখ করেন। প্রভুপাদ ১৯৭০ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে আমেরিকান সদর দপ্তর স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের জুন মাসে মস্কো সফরে গিয়ে প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষ্ণ চেতনার সূচনা করেন। ১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকস্তরে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। প্রথমে মাত্র ৩ জন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের মূল কেন্দ্রটি ১৯৭২ সালেই শুরু হয়।

১৯৭৩ সালে জর্জ হ্যারিসন লন্ডনের ১৫ কিমি. উত্তর পশ্চিম পিগটস ম্যানর নামে পরিচিত একটি ১৭ একর জমি দান করেন। প্রভুপাদের ভক্তরা এটিকে একটি গ্রামীণ মন্দির আশ্রমে রূপান্তরিত করেন এবং প্রভুপাদের সম্মানে এর নামকরণ করে 'ভক্তিবেদান্ত ম্যানর'। ইংল্যান্ডে বহুবার প্রভুপাদ ভ্রমণ করেন। তিনি জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডও ভ্রমণ করেন। মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা, হংকং, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, ইরান সফরে গিয়েও কৃষ্ণভাবনা প্রচার করেন। প্রভুপাদ যেখানেই যান না কেন প্রতিদিন একঘণ্টা সকালে বা ভোরে হাঁটাহাটি করতেন এবং এই হাঁটাহাটির মধ্যেই শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। হাঁটা শেষ করার পর প্রতিদিন তিনি ভাগবতের ওপর বক্তৃতা দিতেন। তিনি দশ বছরে চৌদ্দবার পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ইসকনের শিশুদের জন্য একশোটি মন্দির এবং কয়েক ডজন গুরুকুল খুলেছিলেন। তিনি প্রায় হাজার শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছেন।

পার্থিব শরীর ত্যাগ : প্রভুপাদ ৮১ বছর বয়সে ১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে তাঁর কক্ষে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রভুপাদের ঐতিহ্য প্রতিনিয়ত এই কথা বলে যে 'সাধুদের সংসর্গ সাধুত্বকে অনুপ্রাণিত করে, ভক্তদের সংসর্গ ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃত ভক্তদের সংসর্গ একজন ব্যক্তির চেতনার ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। যখন প্রভুপাদ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই প্রতিষ্ঠাতা নথিতে সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল 'সোসাইটির সদস্যদের একে অপরের সঙ্গে একত্রিত করা এবং শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য অনুভব করা।'

বৃন্দাবন হলো কৃষ্ণের লীলাভূমি। প্রভুপাদও বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবুও তিনি বৃহত্তর স্বার্থে একজন শিষ্যকে লিখেছেন, 'আপনি যেখানেই থাকুন, যদি আপনি কৃষ্ণভাবনায় আপনার অতীন্দ্রিয় কর্মে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হন, তবে সেই স্থানটিও চিরন্তন বৃন্দাবন। চেতনাই বৃন্দাবন সৃষ্টি করে।' ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বিশেষভাবে লেখা ও প্রকাশনাকে উৎসাহিত করেছিলেন, এক সভায় প্রভুপাদকে বলেছিলেন আপনি যদি কখনও টাকা পান, তবে বই ছাপাবেন। তাই প্রভুপাদ যতই ব্যস্ত বা কখনও অসুস্থ থাকুন না কেন বই প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করতেন। ধর্মসংক্রান্ত ইতিহাসবিদ টমাস হপকিন্স বলেছেন যে ইংরেজিতে ভাগবতম এবং চরিতামৃতের মতো রচনা উপস্থাপনা করে প্রভুপাদ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলিকে পশ্চিমি বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন যা আগে সহজলভ্য ছিল না।' সত্যি বলতে কী প্রভুপাদ সারাজীবন শ্রীভাগবতকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার কাজ করেছেন। ধর্মসংক্রান্ত পণ্ডিত এড উইন ব্রায়ান্ট বলেছেন, 'ভাগবতকে মানবজাতির দ্বারা উৎপাদিত সেরা সাহিত্যকর্মে স্থান দেওয়া যেতে পারে।' ভাগবত হলো বারোটি বইয়ের একটি রচনা ('ক্যান্টোস' শব্দটি প্রভুপাদ ব্যবহৃত করেছিলেন) যাতে চৌদ্দ হাজারেরও বেশি শ্লোক রয়েছে। প্রভুপাদ ১৯৫৯ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভাগবতমের ইংরেজি ভাষ্য বা ইংরেজি অনুবাদ শুরু করেন এবং ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রথম ক্যান্টোসটি সম্পূর্ণ ও প্রকাশ করেন। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে পশ্চিমি বিশ্বকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শুনিয়েছিলেন, আর এর প্রায় ৭২ বছর পরে ১৯৬৫ সালে ভারতের আরেকজন হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী প্রভুপাদ সেই আমেরিকায় গিয়ে ইংরেজি ভাষায় আমেরিকানদের বা ইংরেজদেরকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা শুরু করেন। অবশ্য হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে প্রভুপাদকে কোনো ছল, চাতুরী বা হিংসার বা তলোয়ারের আশ্রয় নিতে হয়নি। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে আকৃষ্ট হয়েই তাঁরা হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করেছে। এইভাবে প্রভুপাদ বিশ্বে হিন্দু ধর্মকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। □

চন্দ্রশেখর আজাদ

এক অনন্য সাধারণ বিপ্লবী

দীপক খাঁ

প্রকৃত নাম চন্দ্রশেখর তিওয়ারি। বিপ্লবী জীবনে হন চন্দ্রশেখর আজাদ। বাল্যকালেই পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করেছিলেন। প্রায় কিশোর বয়সেই দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হবার পরই তিনি বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিলের হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য হন। সংগঠনের তহবিল গঠনের জন্য ইংরেজ সরকারের অর্থ তিনি হস্তগত করেন। ১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের ১০ জন সদস্যকে নিয়ে তিনি ট্রেন থেকে সরকারের রাজস্ব লুঠ করেন। ইংরাজ শাসক এই ঘটনাকে 'কাকোড়ি ট্রেন ডাকাতি' বলে অভিহিত করে।

চন্দ্রশেখর আজাদ বিপ্লবী ভগৎ সিংহের বিপ্লবী গুরু ছিলেন। রামপ্রসাদ বিসমিলের পরে তিনিই হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের কমান্ডার-ইন-চিফ হয়েছিলেন। বাইরের লোকের কাছে তিনি 'বলরাজ' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর তিনি অত্যাচারী পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট স্কটকে হত্যা করতে গিয়ে ডিএসপি স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন। যার ফলে তাঁকে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকতে হয়। সেই সময় তিনি ঝাঁসিকে কেন্দ্র করে অভিযান পরিচালনা করতেন। সেখানে সাতার নদীর তীরে এক হনুমান মন্দিরের কাছে একটি কুঁড়েঘর তৈরি করে পণ্ডিত হরিশঙ্কর ব্রহ্মচারী নাম নিয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করে বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন।

ভগৎ সিংহ ধরা পড়ার পর ফাঁসির সাজা নির্ধারিত হলে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করেন। কিন্তু গান্ধীজী কোনো উগ্রবাদী সংগঠনের উগ্রবাদী কারও সঙ্গে দেখা করবেন না বলে এড়িয়ে যান। কারণ গান্ধীজীরা মনে করতেন, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিংহের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বেশিদিন জীবিত থাকলে তাঁরা দেশের যুবসমাজে নায়কের আসন লাভ করবেন। তাই ভগৎ সিংহের ফাঁসির বিরোধিতা করা দূরে থাক, যাতে নির্ধারিত দিনের একদিন আগেই ফাঁসি কার্যকর হয় তার চেষ্টাও নাকি তিনি করেছিলেন।

এর পর চন্দ্রশেখর এলাহাবাদে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভগৎ সিংহকে বাঁচানোর পরিকল্পনার কথা বলেন। কিন্তু নেহরুও সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। তার কারণে নেহরুর সঙ্গে তাঁর তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। বিরক্ত চন্দ্রশেখর নেহরুর সঙ্গে বৈঠক সেরে নিজের সাইকেলে আলফ্রেড পার্কের উদ্দেশে চলে আসেন।

চন্দ্রশেখর ছিলেন সদা তৎপর বিপ্লবী। সবসময় কোনো না কোনো অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য ছটফট করতেন। সেজন্য তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে 'কুইক সিলভার' নামে ডাকতেন। ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি চন্দ্রশেখর আলফ্রেড পার্কে বসেছিলেন। সেই সময় এক বিশ্বাসঘাতক পুলিশকে খবর দিলে পুলিশবাহিনী তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তিনি তাঁর এক সহকর্মীকে রক্ষা করার সময় নিজে আহত হন। কিন্তু তাঁর অব্যর্থ নিশানা তিন পুলিশকর্মী ভবলীলা সাঙ্গ করে। শেষে পলায়ন অসম্ভব বুঝে তিনি নিজের গুলিতেই বীরগতিপ্রাপ্ত হন। তিনি ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা দেবেন না— এমনই তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল। তিনি বারবার বলতেন, 'আমার পিস্তল শত্রুকে সুযোগ দেবে না আমাকে গ্রেপ্তার করার।' এই শপথ তিনি রেখেছিলেন জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও। তাঁর পিস্তলটি প্রয়াগরাজ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। □

সেই বীর, পরাক্রান্ত মহানায়ক আজ ভিখারির বেশে। কোথায় সেই সৈনিকের বিস্ফারিত বৈভব, আর কোথায় এই অভিসারীর ছিন্ন কন্থা।

জ্ঞাতজনের অজ্ঞাতবাস

অম্লানকুসুম ঘোষ

২০২২ সালের কলকাতায় বইমেলায় এই লেখক রচিত 'জ্ঞাতজনের অজ্ঞাতবাস'- শীর্ষক একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের অনুসন্ধানে লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, বস্তী, ফৈজাবাদ এবং লেহ-লাদাখ অঞ্চলে এই লেখকের দীর্ঘদিন কাটানোর ফসল এই উপন্যাস। ইতিমধ্যে একটি ছায়াছবি 'সন্ন্যাসী দেশনায়ক' নির্মিত হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ-মননের উদ্দেশ্যে এই নিবন্ধের অবতারণা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই নিবন্ধটি উপরোক্ত উপন্যাসেরই নির্বাচিত অংশ।

* * *

সবুজ চাদরে ঢাকা নৈমিষারণ্যের জঙ্গল। নিথর, নিরাভরণ গোমতীর তীর সাবিত্রীর হিরণ্যছটায় যোগিনীর বেশ ধরে মৌন মন্থর। প্রাচীন শিবালয় ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। জলা-জঙ্গলের স্বকীয় সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। প্রকৃতির সন্তানেরা এখানে উপেক্ষিত নয়। বিচিত্র রংবেরঙের সাপ ও কীটপতঙ্গের অবাধ রাজ্য। তারই মাঝে সমাহিত সে যুগের বীরবিক্রম, মহাকবির দেশনায়ক মহাকাল।

সে যুগ এযুগে অনেক তফাত, তবু মানুষটা এক অভিন্ন। মানুষের জীবন নিরন্তর বয়ে চলে। যখন থামে, তাকে বলে মৃত্যু। আবার মৃত্যুর আর এক নাম নবীনোচ্ছন্দোচ্ছ্বাসে এক বিমোহিত রূপান্তর। শুরু হয় তার মরণলোক থেকে অমৃতলোকের পথে অনির্বাণ যাত্রা। কিন্তু যারা বেঁচেও মরে আছে, তারা মৃত ভূত। তাদের কথা স্বতন্ত্র হলেও তারা এই মরলোকেরই অবিচ্ছিন্ন সত্তা। তারা ছিল, তারা আছে। তারা কি থাকবে? তারাও তো মানুষ। মানুষই মরণশীল সৃষ্টিচক্রের বিস্ময়। চলে যায় মানুষ, মনের মানুষ। আবার কি ফিরে ফিরে আসে? হয়তো আসে, জানা নেই। আসলে সে তো নতুন মানুষ; অচেনা মানুষ।

আজ সকাল থেকে মহাকালের মন অধোগামী হয়েছে। সারাক্ষণ অতীত স্মৃতির অলিগলি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ফেলে আসা সময়ের কিছু বিশেষ মুহূর্ত। কত মনের মানুষ যে সে মহামিছিলে যোগ দিতে ছুটে আসছে, তার হিসেব নেই। মহাকালের কণ্ঠে আজ বজ্ররোষ নেই। এক পশলা মায়া বৃষ্টিতে ভিজে আজ স্মৃতিমেদুর।

ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, জগদম্বে, জগদম্বে। সরস্বতী তখন দক্ষিণের বারান্দায় এককোণে কাঁচা মাটির উনুনে ফুঁ দিয়ে কোনো উপায়ে আগুন জ্বালাতে চাইছেন। বেশি লোকের রান্না ছোটো উনুনে হবে না, তাই বড়ো উনুন কিনে এনেছে শিবনারায়ণ। একদিনে কি আর শুকোয়, পবিত্রবাবুর যেমন আক্কেল, ক'দিন আগে তার পাঠালে কি কষ্ট হতো? দুম করে যখন তখন খবর দিলেই হলো। সরস্বতী ধোঁয়ার তাণ্ডবে অশ্রুসিক্ত হয়ে ঝাঁকুনির স্বরে জবাব দিলেন, এইতো এত চীৎকার চ্যাঁচামেচির কী হলো। এতগুলো মানুষ আসছে, রান্নাবান্না না করে তোমার সামনে বসে হা-হুতাশ শুনলে চলবে? সামলাতে তো আমাকেই হবে। রাজকুমারটাও গেছে তো আসার নাম নেই, আমার হাড় জ্বালাতে কেউ কম যায় না।

মহাকাল একটু লঘুস্বরে বললেন, জগদম্বে, রাগলে তোমায় একেবারে মা

ফঃ ৫

জগদম্বা মনে হয়। সরস্বতী বাঁ হাতের কবজির শুকনো অংশ দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 'হ্যাঁ মা জগদম্বারও এত ধৈর্য ছিল না। সেও অতিষ্ঠ হয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে পালাত।' মহাকাল গলা খাঁকারি দিয়ে অন্য কিছু বলতে গিয়েও লঘুরসে ভঙ্গ না দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, তুমি কি আমাকে ছেড়ে পালাতে চাও? অনেক চেষ্টা করে এবার আগুনটা একটু ধরেছে। গোমতীর খোলা বাতাসে প্রজ্বলিত শিখা চঞ্চল হয়েছে। সরস্বতী তাঁর আরাধ্য দেবতা মহাকালের দিকে চেয়ে বললেন, তা যদি পারতাম ঠাকুর তবে তো ল্যাঠা চুকে যেত। মহাকাল সরস্বতী মা-র দিকে একবার দেখলেন। মুখে কিছু না বললেও তাঁর প্রসন্নতা অনেক কিছু বলল।

পণ্ডিত মহাদেব প্রসাদ শাস্ত্রী যেদিন প্রথম দেখা করতে এলেন, সরস্বতী একহাত ঘোমটা টেনে বাপের পেছন পেছন এসে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতজী সম্পূর্ণানন্দের সাংকেতিক চিরকূট এগিয়ে দিলেন মহাকালের হাতে। দীর্ঘ নীরবতার পর মহাকাল বললেন, ও পারবে তো, বড়ো কঠিন। সরস্বতী মহাকালের কথা শেষ হওয়ার আগেই আয়ত নয়নে বাবার হাত টেনে জবাব দিলেন, পারব। সেদিন রাজকুমার সঙ্গে আসেনি। পরদিন তাকে নিয়ে এলেন। শিশু রাজকুমারকে দেখে মহাকাল দুশ্চিন্তায় পড়লেন। মানস সরোবরে দুর্গম, বরফানি পথে এই অবোধ বালকটি সহযাত্রী হওয়ার যোগ্য? পরে অবশ্য রাজকুমার সে পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

রাজকুমার দৌড়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে, পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ও মা গরম মশলা পাইনি, হনুমানগড়ির দিকে একটা বড়ো দোকান আছে, ওখানে পাওয়া যাবে, যাব? রাজকুমারটা যত বড়ো হচ্ছে, দুরন্তপনা ততই বাড়ছে। সে ভাবছে, মা একবার বললেই সে পাণ্ডবকুয়া পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কবাডি খেলার সুযোগ পাবে। মহাকাল বললেন, না রে বাবা, তোকে আর গরম মশলার জন্য ছুটতে হবে না, গরমমশলা ছাড়াই....?

সরস্বতী মা অল্পসময়ের মধ্যেই, মহাকালের সান্নিধ্যে খাঁটি বাঙ্গালি রান্না শিখে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নিত্যসেবায় উপকরণের বড়োই অভাব, তবু যেদিন যা জোটে তাতেই দিনাতিপাত করে চারটে প্রাণী। আজ বেশ কিছু বিশেষ আয়োজন হয়েছে।

আলু-পটোলের ডালনায় জল ঢেলে সরস্বতী বললেন, থাক্, তবে আর যেতে হবে না, তুই বরং কুয়া থেকে আমায় জলটা তুলে দে। রাজকুমারের চোখ দুটো খুশির চমকে চকচকিয়ে উঠল। ভগবানজী সস্নেহে অবোধ শিশুকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, দেখিস বাবা, কুয়োতলায় শ্যাওলা পড়ে খুব পিছল হয়েছে। সাবধান, বেশি ছুটোছুটি করিস না।

একবার যখন কুয়োতলায় যাওয়ার অনুমতি পাওয় গেছে, রাজকুমার সে সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। মওকা বুঝে বিষয়ান্তরে গেল সে।

—জানো দাদু, আজ না চক্রতীর্থের ধারে কটা লোক ঘোরাঘুরি করছিল।

—তা করুক না, তাতে কী....?

সরস্বতীর গাটা যেন ছ্যাঁত করে উঠল। চকিতে মহাকালের দিকে তাকালেন। মহাকাল নিরুত্তাপ। শিশুমনে কোনো অকারণ ভয় জন্মায় তা তিনি চান না। বললেন, চক্রতীর্থ এতবড়ো তীর্থস্থান, কত তীর্থযাত্রীরা আসে, লোক ঘোরাঘুরি তো করবেই, তাতে আমাদের কী? কেন, তোমাকে কি কিছু জিজ্ঞেস করছিল নাকি?

উৎকণ্ঠায় সরস্বতীর যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা।

—হ্যাঁ দাদু, আমায় একটা বুড়ি জিজ্ঞেস করল—

—সর্বনাশ, কী জিজ্ঞেস করল রে? সরস্বতীর যেন একদণ্ডও তর সইল না, এগিয়ে এসে রাজকুমারের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কী জিজ্ঞেস করছিল বল?

মহাকাল এতক্ষণে একটু বিচলিত। কিছু অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের অবস্থানে যতটা না, তার চাইতে অনেক বেশি সরস্বতীর উৎকণ্ঠা দেখে। একটু ধমকের স্বরে বললেন, আহ্, জগদম্বে, এত উতলা হওয়ার কী আছে? সরস্বতী একবার মহাকালের দিকে আড়চোখে দেখে আবার রাজকুমারের কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বল, কী বলছিল বুড়িটা?

রাজকুমার কাঠমাণ্ডু থেকে নৈমিষ অনেক উথালপাতাল দেখছে। পরিস্থিতি কখন রং বদলায়, কখন যে বাতাস ভারী হয়, তা বুঝতে তার অনাবিল শৈশব অন্তরায় হয় না কখনও। মহাকালের দিকে সোজা তাকিয়ে সে নির্ভয়ে বলল, বুড়িটা জিজ্ঞেস করছিল, শিবালয় কোন দিকে।

—সর্বনাশ, আমি যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই। বাবা তুমি শিগগির পেছনের জঙ্গল দিয়ে খাণ্ডহারে যাও। আর দেরি করো না, মহাবিপদ।

—জগদম্বে, তুমি তোমার কাজ করো। মহাকাল যখন জেগে আছে, মহাপ্রলয়ের যে কোনো সম্ভাবনা সে এক মুঠোয় ভরে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে।

—তাই করো বাবা তাই করো, তোমার কোনো বিপদ চোখে দেখতে পারব না। তোমার সব শত্রু নিধন হোক।

—জগদম্বে, মহাশক্তির ঘেরাটোপে আমি বসে আছি। আর পবিত্র, মেহের সবসময় সজাগ। আমার মনে হয় ওরাই আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সরস্বতী দেখলেন কয়েকজন শিবালয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। কাউকেই তাঁর চেনা লাগছে না। রাজকুমার ছুটে গিয়ে দেওয়ালের নির্দিষ্ট ফুটো দিয়ে পাকা গোয়েন্দার মতো সব কিছু দেখে তির-ধনুক তাক করল। বন্ধুরা মিলে সদ্য তির-ধনুক বানিয়েছে দশহরায় রামলীলা করবে বলে। রাজকুমার ফিসফিস করে বলল, দাদু, ওই বুড়িটাই আসছে।

সরস্বতী দরজায় খিল এঁটে পেছনের জঙ্গল দিয়ে ঘুরে শিবালয়ের উঠোন পেরিয়ে সদর দরজায় এলেন। কোমরে খোঁটা গুঁজে হাতের লাঠিটা শক্ত করে দাঁড়ালেন। দূরে চক্রতীর্থের পূর্ব দিক থেকে তখন এগিয়ে আসছে সেই অজ্ঞাতপরিচয় যাত্রীদল। চোখে মুখে তাদের তখন চাতকের তৃষ্ণা। মন্থর নদী যেমন হঠাৎ

চঞ্চল হয়ে ওঠে, পিপাসায় দু'কূল ছাপিয়ে আছড়ে পড়তে চায় মহাসমুদ্র সঙ্গমে। ওরা হনহন করে এগিয়ে আসছে প্রাচীন শিবালয়ের দিকে। মহামিলনের দুর্বার অভীপ্সা ওদের সর্বাঙ্গে। দু'জন পুরুষ, একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ও একজন বৃদ্ধা। দেখে বৃদ্ধা লাগলেও তাঁর দর্পিত চালে মনে হয়, যুবতীর চুল সাদা করে কোনো রঙ্গমঞ্চে পাঠ করতে নামানো হয়েছে।

লীলাবতীর সম্মোহনী তাঁর রূপ নির্ভর নয়, তার উৎস অনেক গভীরে। শৈল দিদির পাশে ছায়ার মতো অনুসরণকারী। কখনও সে লীলাবতীর ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে, আবার কখনও অজানা উৎকণ্ঠায় পিছিয়ে পড়ছে। হঠাৎ সামনে বেণুকে দেখে চমকে উঠলেন সরস্বতী। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সে আগে কয়েকবার ভগবানজী সকাশে এসেছে। বেণু সরস্বতীকে প্রণাম জানাল। সরস্বতী আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা গো বেণুবাবু, ওরা কি তোমার সঙ্গে?

—তুমি জানো না আজ লীলাদি আসছেন?

—ও তাই বলো, আমি তো ভয়ে মরি আর কী।

—তাই বুঝি লাঠি হাতে ঝাঁসির রানি সেজে দাঁড়িয়ে।

সরস্বতী জিজ্ঞেস করল, বাবা যে বলল পবিত্রবাবু বলেছেন শিবনারায়ণ পথ দেখিয়ে আনবে? বেণু রসিকতা করে বলল, মাতাজী,গোয়েন্দাদের কথা কখনও বিশ্বাস করো না, ওরা বলে এক, করে আর এক। সরস্বতী মা না দাঁড়িয়ে ভিতরে খবর দিলেন।

লীলার আগমন বার্তা মহাকালের দেহ মনে যে আবেশ জাগাল তার ঢেউ লাগল ইতিহাসের পুরনো পাতায়। হলুদ মড়মড়ে পৃষ্ঠা কাঁপিয়ে এক-একটি ছত্র উঠে এসে কত কথা মনে করিয়ে দিল। সে সব কথা মানে ভারত ইতিহাসের এক একটি আগুন লাগা অধ্যায়। সে অধ্যায় তাজা রক্তে যতটা লাল, ততটাই বিপ্লবের অগ্নিশিখায় ভাস্বর। মহাকালের সত্তায় এক অদ্ভুত মেদুরতা নিয়ে এল। সেই বাইশ সাল। আজ আজ চৌষট্টি। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর। মহাকাল দেখতে দেখতে ভাব সমাধিতে হারিয়ে গেলেন।

বিষয়ের গভীরতা বুঝতে সরস্বতীর অসুবিধা হলো না। দোরগোড়ায় অতিথি নারায়ণ। মন্দিরে দেবতা নিথর নির্বাক। সরস্বতী মা নিরুপায় হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, কী গো বাবা, ওরা যে এসে পড়লেন, কোথায় বসাব? ভিতরে আনব কি? তুমি কি সামনে আসবে, না পর্দার আড়ালে যাবে?

—জগদম্বে, ওরা কী নিয়ে আসছে জানো? আমার অতীতের অনেকটা সময়।

—বাবা, তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝি না।

—সত্যি আমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই, ঘর নেই, আপনজন নেই, পরের জন নেই, জিনিস নেই, পত্তর নেই, ব্যস। কী সুন্দর! মা একেবারে ঝাড়া হাত-পা করে দিয়েছেন, এমন কোনো জিনিসই রাখেননি, যার জন্য মরার সময় মনটা কেমন কেমন করতে পারে।

এই ভিখারির কাজ হলো কনজামশান অফ হিজ ওরডেন্ড মিশন, পার্সোনালি তার কী হলো, না হলো, ইট ডাজ্ নট ম্যাটার।

নৈমিষারণ্যের আকাশে তখন মেঘ। বাতাসে অজানা আনন্দ। ইতিহাসের দুই পর্ব আজ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মহামিলনের প্রতীক্ষায়।

পবিত্রমোহনের গোয়েন্দাগিরির অভ্যাস এখনও যায়নি। পবিত্রমোহন আজাদ-হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের বিশ্বস্ত লোক। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তবু গোয়েন্দাগিরি থামেনি। সোজা নজর তাঁর চলে না। সোজা জিনিসও উলটো করে আগে পরখ করতে হয় গোয়েন্দাদের। কিন্তু সেহেন পবিত্রবাবুও আজ মহা দ্বন্দ্বে পড়েছেন।

লীলাবতীর নৈমিষে আসাটা এখনই সমর্থন করতে পারছেন না। লীলা রাজনীতির লোক। আজকাল আবার গান্ধীবাদীদের সঙ্গে ওঠাবসা। ওই গান্ধীবাবার সাঙ্গপাঙ্গোরাই তো মানুষটাকে দেশছাড়া করে ছাড়ল। দু-দু'বারের নির্বাচিত সভাপতি, তবু দলের মধ্যে চূড়ান্ত অসহযোগ, আর ওই বুড়োভাম ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে নিজের তৈরি রামধুন জপছে। যতসব ভণ্ডের দল। লীলাবতীর শাগরেদরা আজকাল তাদের দলে ভিড়েছে, প্রজাকল্যাণে নতুন সমাজবাদী দল করেছে। এতে প্রজাকল্যাণ তো ছাই হবে, শুধু তার হাতে গড়া এতবড়ো দলটা রজনীপামের হাতের পুতুল হয়ে দেশটার সর্বনাশ করবে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি জাদুর ছড়ি ঘুরিয়ে আমাদের শেখাবে, আমরা সব জারজ সন্তান। আমাদের কিচ্ছু নেই। আমাদের অতীত বলে কিছু ছিল না, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। যাক, মহাকাল চাইছেন লীলাবতীর সঙ্গে সত্বর একবার দেখা করতে। তবে তাই হোক, তাঁর চাওয়া তো দেশের-দশের কল্যাণের পরিপন্থী হবে না।

অতুল সেনের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও নৈমিষ এসে অনুসন্ধান করতে ছাড়েননি পবিত্রমোহন। পরমারাধ্যের চরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছে তাঁর জীবন। তবু সন্দেহের দোলায় হতাশার বাতাস রাশি রাশি সংশয়ের মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে এসে মনটা ভারাক্রান্ত করে তোলে। আজ সে নিশ্চিত হতে পারবে। লীলাবতীর আসাটা মন থেকে সমর্থন করতে না পারলেও সে জানে, তার যাচাইয়ের নিক্তি আর কষ্টিপাথর লীলাদি। লীলা নাগ থেকে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় হয়ে ওঠার গগনচুম্বী অভিজ্ঞতা। তেমনই তাঁর বিচক্ষণতা। এসো, আজ তবে হতে হবে সত্যের মুখোমুখি। সত্য হলে পাবে রাজপাট। আর যদি হয় মিথ্যা প্রতারণা, তবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ক্ষমিব না কোনো আবেগের বশে।

সেই বীর, পরাক্রান্ত মহানায়ক আজ ভিখারির বেশে। কোথায় সেই সৈনিকের বিস্ফারিত বৈভব, আর কোথায় এই অভিসারীর ছিন্ন কন্থা।

লীলা, সমর, বেণু ও শৈল নাটমন্দিরে অপেক্ষা করছে। অন্তরের অস্থিরতায় দেশনেত্রী লীলার সমস্ত মুখমণ্ডলে ঘাম চিক্ চিক্ করছে। তবুও সমাহিত মূর্তির মতো একাগ্র প্রতীক্ষা। আর কতক্ষণ এই অপেক্ষার পর্ব চলবে কে জানে। বেণু রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছে। কখন যে লীলাদির ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তার ঠিক নেই।

(লেখক চলচ্চিত্র পরিচালক ও ঔপন্যাসিক)

প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ যে বই

গৌতম কুমার মণ্ডল

প্রকাশের আগেই কোনো বই কি নিষিদ্ধ হয়েছে? উত্তর হলো হয়েছে। আর বইটি হলো বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের লেখা বই 'The Indian War of Independence 1857'। সাভারকরকে আজকের ভারতবর্ষ যতই বিতর্কিত চরিত্র করে তুলুন না কেন, তিনি যে একজন প্রখর দেশভক্ত বিপ্লবী ছিলেন সেকথা অস্বীকার করা খুবই অন্যায়। তিনি যখন আইন পড়তে লন্ডনে গিয়েছিলেন সেই ১৯০৭ সালে, তখন মহাবিদ্রোহের ৫০ বছর পূর্তির সময়কাল। এই বিদ্রোহ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিদেশি ইতিহাসকারেরা বেশ কয়েকটি বই লিখে ফেলেছেন। সাভারকর সে সব বই পাঠ করেছিলেন, কিন্তু এই মহান বিপ্লবের যথার্থ ইতিহাস খুঁজে পাননি। তাই নিজেই বহু অধ্যবসায় ও তথ্য সংগ্রহ করে লিখলেন মহাবিদ্রোহের প্রথম ইতিহাস যা ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। বইটি লিখলেন নিজের মাতৃভাষা মারাঠিতে। লেখা শেষ হলো ১৯০৮ সালে। সাভারকরের বয়স তখন মাত্র ২৪ বছর। পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ সাভারকর লন্ডনের ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটির সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা করেছিলেন। গোয়েন্দারা এখান থেকেই টের পেয়ে যান পাণ্ডুলিপিতে কী আগুন আছে! ব্যস, বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

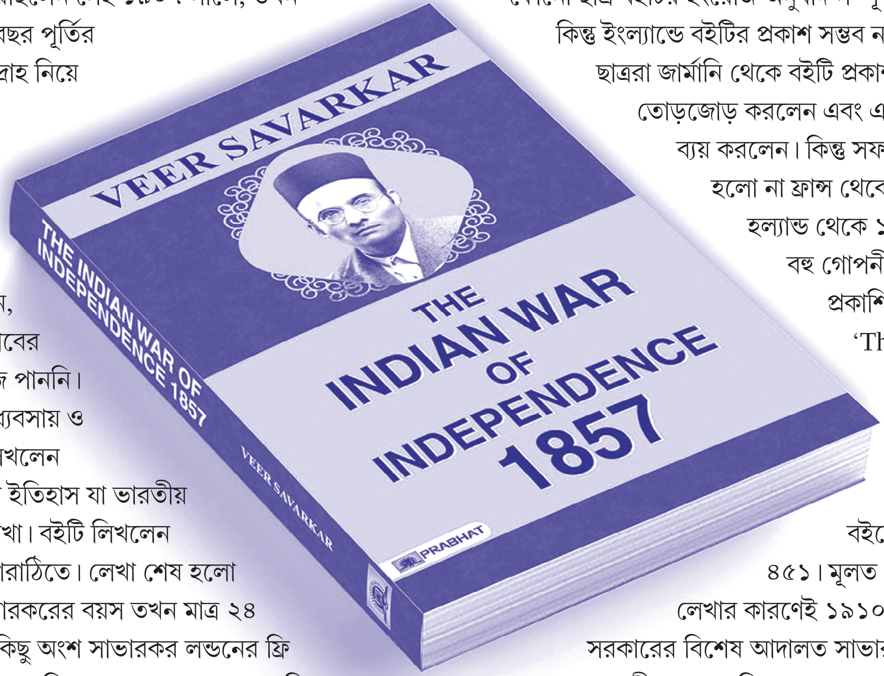

তারপর এই বই প্রকাশ করার জন্য লন্ডনের দেশভক্ত তরুণ ভারতীয় ছাত্ররা বহু গোপন উদ্যোগ নেন। সে এক মজাদার ইতিহাস যা বহু রোমাঞ্চে ভরা। বইটি সম্পর্কে সাভারকরের আলোচনার পরই দেখা যায় পাণ্ডুলিপির দু' একটি অধ্যায় নিরুদ্দেশ। সেগুলি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে জানা যায় গোয়েন্দাদের কোনো চর এই অংশ চুরি করে পৌঁছে দিয়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সদর দপ্তরে। তা সত্ত্বেও মূল পাণ্ডুলিপি সাভারকরের উদ্যোগে আবার ঠিকঠাক করে গোপন পথে পৌঁছে যায় বোম্বাই বন্দরে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের কোনো প্রেস এটি প্রকাশ করার সাহস দেখায়নি। শেষ পর্যন্ত এই পাণ্ডুলিপি আবার অত্যন্ত গোপনীয়তায় প্যারিস পৌঁছয়, সেখান থেকে লন্ডনে লেখকের হাতে।

লন্ডনে তখন বহু তরুণ ভারতীয় ছাত্রের পড়াশোনা করছেন। তাঁরা নিজেদের মতো করে দু' একটি সংগঠন তৈরি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। এরকমই একটি সংগঠন ছিল অভিনব ভারত সিক্রেট সোসাইটি। বিদেশে থেকেও মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের জন্য এঁরা কাজ করেছেন। অভিনব ভারতের এক তামিল বিপ্লবী ছাত্র ভিভি এস আইয়ার (১৮৮১- ১৯২৫)-এর তত্ত্বাবধানে মারাঠি জানা কোনো ছাত্র বইটির ইংরেজি অনুবাদ সম্পূর্ণ করলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডে বইটির প্রকাশ সম্ভব নয়। প্রথমে ছাত্ররা জার্মানি থেকে বইটি প্রকাশ করার তোড়জোড় করলেন এবং এজন্য বহু অর্থ ব্যয় করলেন। কিন্তু সফল হলেন না। হলো না ফ্রান্স থেকেও। শেষ পর্যন্ত হল্যান্ড থেকে ১৯০৯ সালে বহু গোপনীয়তার সঙ্গে প্রকাশিত হলো— 'The Indian War of Independence 1857'। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫১। মূলত এই বইটি লেখার কারণেই ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকারের বিশেষ আদালত সাভারকরকে দু'টি মেয়াদের যাবজ্জীবন সাজা হিসেবে ৫০ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়। ভাবুন, একটি বইয়ের জন্য সরকারের কী ভয়! সাধে কী বলে তলোয়ারের চেয়েও কলম শক্তিশালী! আর দুটি যাবজ্জীবন মেয়াদের সাজার কথাও কি কেউ কখনো শুনেছে?

যাইহোক, হল্যান্ডে প্রকাশের পর চোরাপথে বইটির ১০০ কপি বোম্বাই বন্দরে এসে পৌঁছায়। বন্দরে লালমুখো কাস্টমস কর্তাদের চোখে ধুলো দিতে নানান মজাদার উপায় অবলম্বন করতে হয়েছিল। এসব কাজে ভারতীয় ছাত্ররা রীতিমতো পাকা ছিলেন। চকচকে কাগজে মুড়ে, তারপর আবার কাগজের বাক্সে ভরে সেই নিষিদ্ধ বই ঠিক চলে এসেছিল। বাক্সের গায়ে কোথাও লেখা 'Don Quixote', কোথাও 'Scott's Works', কোথাও-বা 'Pickwicks'। পরে আবার হাজার কপি বই এভাবেই চলে আসে। পৌঁছে যায় ভারতের নানা প্রান্তে বিপ্লবীদের হাতে। বইয়ের এই প্রথম সংস্করণ

অভিনব ভারতের বিপ্লবী ছাত্ররা দেশের নানা প্রান্তে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিলেন বিনামূল্যে। তারপর এই বই প্রকাশিত হয়েছে ফ্রান্স থেকে এবং সে দেশ-সহ আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, মিশর প্রভৃতি বহু দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে এই নিষিদ্ধ বই।

১৯০৭-'০৮ সালে যথার্থ গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে সাভারকর এই বই রচনা করেন। এই সময় বেশ কয়েকমাস তিনি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে বসে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি যে ইতিহাস লিখলেন তা শুধুই তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হলো না। বইয়ে যেমন বিপ্লবীর আবেগ এল তেমনি এল মহান সিপাহিদের প্রতি ঋণশোধেরও তাগিদ। সাভারকর এই ইতিহাস না লিখলে আজ হয়তো হারিয়ে যেত তাঁতিয়া টোপি, মঙ্গল পাণ্ডে, কুনোয়ার সিংহ, আহমাদুল্লাহ শাহ, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈদের বীরগাথা। কিংবা হয়তো এঁরা কিছু অবাধ্য সৈনিকের এক সামান্য বিক্ষোভের নায়ক-নায়িকা হিসেবেই বিবেচিত হতেন। সাভারকরই ইংরেজ-কথিত সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের 'স্বাধীনতা' সংগ্রাম বলে দাগিয়ে দিলেন। আর আগামীদিনের তরুণদের মনে দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার স্বপ্ন এনে দিলেন। তাই গোপনে প্রকাশের পর থেকেই এই বই দেশের বিপ্লবীদের কাছে ছিল এক অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। বইটির একটি কপি সংগ্রহ করতে পারলে তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতেন। একে তো নিষিদ্ধ বইয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে বেশি, তার উপরে ছাত্র-যুবাদের মনে দেশভক্তির উন্মাদনা নিয়ে আসত এই বই। তাই গোপনে পাওয়া গেলেও এই বইটির দাম তখন হু হু করে বাড়তে থাকে। এমনকী ১৯১১ সালেই এই বইয়ে একটি কপির দাম কোথাও কোথাও হয়ে যায় ৩০০ টাকা!

এই তুমুল চাহিদার মধ্যেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯১০ সালেই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় মূলত মাদাম কামা ও লালা হরদয়ালের উদ্যোগে। বইটির হিন্দি, পঞ্জাবি, উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয় আর ভারতে চলে আসে। ভারতের বাইরে ইংরেজি বইটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে বিপ্লবী ভগত সিংহ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর বিপ্লবী দলের সদস্যদের চড়া দামে বই বিক্রি করে তা দলের তহবিলে জমা করতেন। ভগত সিংহ এবং তাঁর সহযোগীরা ধরা পড়লে তাঁদের প্রায় সবার কাছ থেকেই পুলিশ এই বই বাজেয়াপ্ত করে।

সাভারকরের গ্রেপ্তারির পর প্যারিসে মাদাম কামার হাতে আসে মূল মারাঠি পাণ্ডুলিপিটি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হাতে যাতে পাণ্ডুলিপিটি না চলে যায় তার জন্য মাদাম কামা এটি ব্যাংক অব ফ্রান্সে জমা রেখে দেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ফ্রান্স আক্রমণের পর ফ্রান্সের অবস্থা যখন টলমল, তারপর থেকেই সেই পাণ্ডুলিপির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বইটির পঞ্চম সংস্করণ তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদের জন্য নিত্যপাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। বিদেশে বইটি নানা জায়গা থেকে আরও বেশ কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। তবে কোথায় কখন প্রকাশিত হয়েছে তার সব হিসেব নেই। যেমন বইটির তামিল অনুবাদ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কে কোথা থেকে এই অনুবাদ প্রকাশ করেন তা জানা যায় না। স্বাধীনতার আগে সব প্রদেশে কংগ্রেসের সরকার গড়ে উঠলেও বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠেনি। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় জনমত গড়ে উঠতে থাকে। এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে বোম্বাইয়ে নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে বইটি প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়। চাপে পড়ে ১৯৪৬ সালে বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের উদ্যোগে বইটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। বহুদিন পর বইটি মুক্তির আকাশ দেখতে পায়।

তবে এত সবের মধ্যে বইটির মূল মারাঠি পাণ্ডুলিপিটি একেবারেই নিখোঁজ হয়ে যায়। সাভারকরের গ্রেপ্তারির পর প্যারিসে মাদাম কামার হাতে আসে মূল মারাঠি পাণ্ডুলিপিটি। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের হাতে যাতে পাণ্ডুলিপিটি না চলে যায় তার জন্য মাদাম কামা এটি ব্যাংক অব ফ্রান্সে জমা রেখে দেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ফ্রান্স আক্রমণের পর ফ্রান্সের অবস্থা যখন টলমল, তারপর থেকেই সেই পাণ্ডুলিপির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। একটি নিষিদ্ধ বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি এভাবে চিরতরে হারিয়ে গেল। □

সকলকে আমন্ত্রণ

আগামী ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবনের 'রামকৃষ্ণ হল'-এ দেশবরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

এই উপলক্ষ্যে 'জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্টে'র পক্ষ থেকে সকল জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমী মানুষকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

স্থান : রামকৃষ্ণ হল

স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবন (দ্বিতল)

১০৫, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

যোগাযোগ : 9123667710, 9748761266

বালক নামদেব

আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো মহারাষ্ট্রের পন্ধরপুরের ভক্তি আন্দোলনের এক ব্যক্তিত্ব হলেন ভক্ত নামদেব। তিনি খুব বাল্যকালেই ভগবান বিঠ্ঠলজীর দেখা পেয়েছিলেন। বিঠ্ঠলজী ভগবান কৃষ্ণেরই এক রূপ। আমাদের যেমন গোপাল ঠাকুর। রাজস্থানের সাধিকা মীরাবাঈয়ের মতো তিনিও ভগবানের নাম কীর্তন করে মানুষের মধ্যে ভক্তিভাব জাগ্রত করতেন। তাঁর সংবেদনশীল মনের অনেক গল্প আছে।

নামদেবের বাল্যকালের ঘটনা। একদিন নামদেবের মা ওষুধ বানানোর জন্য তাকে জঙ্গল থেকে আমলকি গাছের কিছুটা ছাল আনতে বললেন। মায়ের কথামতো নামদেব আমলকি গাছের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক খুঁজে একটি আমলকি গাছ দেখতে পেয়ে ছুরি দিয়ে গাছের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

রাস্তায় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা হলো। নামদেব সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী তার হাতের পুটলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কী? নামদেব বললেন, এটা আমলকি গাছের ছাল। তার মা ওষুধ বানাবার জন্য তাকে এই ছাল নিয়ে আসতে বলেছেন।

সন্ন্যাসী বললেন, তুমি কি জানো না যে এই ছাল তোলার জন্য গাছটির কত কষ্ট হয়েছে? মনে রেখো, গাছেরও আমাদের মতোই প্রাণ আছে। তাদেরও দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি আছে। আর

গাছকে আমরা বৃক্ষদেবতা বলি। কবরেজরা ওষুধ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন গাছের ছাল তুলে নিয়ে যায় কিন্তু তারা তার আগে সেই গাছের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলেন, হে বৃক্ষদেবতা, আমি অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এটা আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির নিয়ম।

সন্ন্যাসীর কথায় বালক নামদেব খুব প্রভাবিত হলো। বাড়ি পৌঁছে মায়ের হাতে আমলকি ছাল দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা ছুরি নিয়ে নিজের পায়ের চামড়া তুলতে শুরু করল। এরফলে প্রচণ্ড রক্ত বের হতে লাগল। রক্ত গড়িয়ে ঘরের বাইরে যেতেই তার মায়ের নজরে পড়ল। মা ছুটে ঘরে এসে পুত্রের ওই অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, পুত্র এটা কী করছ?

নামদেব বলল— মা, আমলকির ছাল নিয়ে আসতে দেখে রাস্তায় এক সন্ন্যাসী বললেন, মানুষের মতো গাছেরও প্রাণ আছে। গাছকে আঘাত করলে তাদেরও কষ্ট হয়। আর তার ছাল তুললে তারাও যন্ত্রণায় ছটফট করে। তাই আমি দেখছি, চামড়া তুললে কত কষ্ট হয়।

একথা শুনে নামদেবের মা তাকে কোলে তুলে নিয়ে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। ছোট্ট পুত্রের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পেয়ে আনন্দে তাঁর চোখে জল এসে গেল। মা তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বললেন, হ্যাঁ বাবা, গাছেরও প্রাণ আছে। আঘাত করলে তাদেরও কষ্ট হয়। আমি আর তোমাকে কোনোদিন গাছের ছাল আনতে বলব না।

ছোট্ট বন্ধুরা, এই নামদেব বড়ো হয়ে প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে ভগবানের দর্শন করেছেন। তিনি কীর্তনের মাধ্যমে প্রচার করেছেন, এই জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রয়েছে, তাই কারও কোনোরূপ ক্ষতি না করে তাকে রক্ষা করতে হবে।

—অবিনাশ চন্দ্র

জাতীয় উদ্যান

জিম করবেট

জিম করবেট জাতীয় উদ্যান ভারতের সবচেয়ে পুরনো উদ্যান। ১৯৩৬ সালে বিপন্ন বাঘ রক্ষার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। উত্তরাখণ্ড রাজ্যের নৈনিতাল ও পৌড়ী গাড়োয়াল জেলায় অবস্থিত। শিকারি ও প্রকৃতিবিদ জিম করবেটের নামানুসারে এই উদ্যানের নামকরণ হয়েছে। উদ্যান জুড়ে রয়েছে পাহাড়, নদী, জলাভূমি, তৃণভূমি। একটি বিশাল হ্রদ রয়েছে। শাল, পিয়াল, অশ্বত্থ ও আমগাছে পরিপূর্ণ এই উদ্যান। এই উদ্যানের ৭৩ শতাংশ বন এবং ১০ শতাংশ তৃণভূমি। এতে ১১০ রকমের গাছ, ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৫৮০ প্রজাতির পাখি এবং ২৫ প্রজাতির সরীসৃপ রয়েছে। এই উদ্যান বরাবরই পর্যটক ও বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের আকর্ষণের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

এসো সংস্কৃত শিখি-৫২

पुंलिङ्ग

एषः – एते (এ– এরা)
एषः कः ? (এ কে?)। **एते के ?** (এরা কারা?)
एषः बालकः । एते बालकाः (এ বালক– এরা বালক)
अभ्यास कुर्मः--
एषः वृद्धः– एते वृद्धाः।
एषः शिक्षकः – एते शिक्षकाः।
एषः नायकः– एते नायकाः।
एषः सैनिकः– एते सैनिकाः।
एषः देवः– एते देवाः।
प्रयोग कुर्मः
विदुषकः, आरक्षकः, रजकः, तक्षकः, सेवकः, सञ्चालकः, गृहस्थः, सैचिकः, पोषकः, तरुणः, प्रबन्धकः।

ভালো কথা

কাঠবেড়ালির ছানা

আমাদের বাড়ির উঠোনের কাঁঠালগাছের কোটরে তিনটে কাঠবেড়ালির ছানা হয়েছে। কোটর খুব উঁচুতে নয়। আমি রোজ একবার টুলে উঠে ওদের ছানা তিনটেকে দেখি। আমি কোটরের কাছে এলেই ওদের বাবা-মা ছুটে এসে কিচিরমিচির করে, আমার দিকে তেড়েও আসে। ছানা তিনটের চোখ ফোটার পরে একদিন একটি নীচে পড়ে গেছিল। অমনি ওদের মা-বাবা ছুটে এসে বলের মতে গড়িয়ে গড়িয়ে গাছের গোড়ায় নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোটরে আর উঠাতে পারছিল না। আমি একটা টুল নিয়ে ভয়ে ভয়ে গাছতলায় গিয়ে ছানাটিকে হাতে নিয়ে টুলের উপর উঠে কোটরে রেখে দিলাম। এরপর থেকে ছানাগুলেকে দেখতে গেলে ওদের মা-বাবা আর আমার দিকে তেড়ে আসে না।

শিউলি জানা, কাঁথি, ষষ্ঠ শ্রেণী, পূর্ব মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) দূ ব্দ ণ শ
(২) ণ র্ষ র ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ক্ষ সা হি ব ক র
(২) হো চো ম ম রা রা

৬ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) পবনপুত্র (২) বিদেশনীতি

৬ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর
(১) দূরদূরান্ত (২) দেহাবসান

উত্তরদাতার নাম
(১) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (২) শিবম রায়, ডায়মণ্ডহারবার, দ: ২৪ পরগনা।
(৩) শ্রেয়া রক্ষিত, কাটজুড়িডাঙ্গা, বাঁকুড়া (৪) বিবেক রায়, হালিশহর, উ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

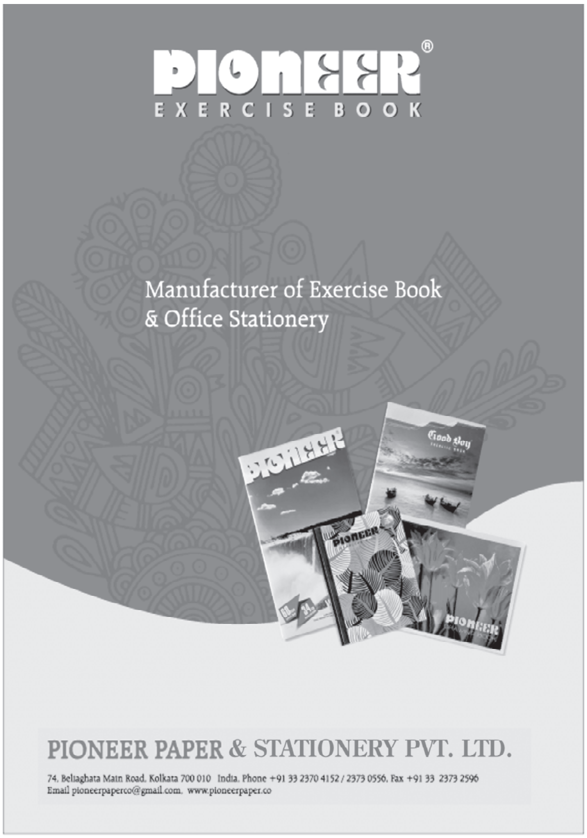

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

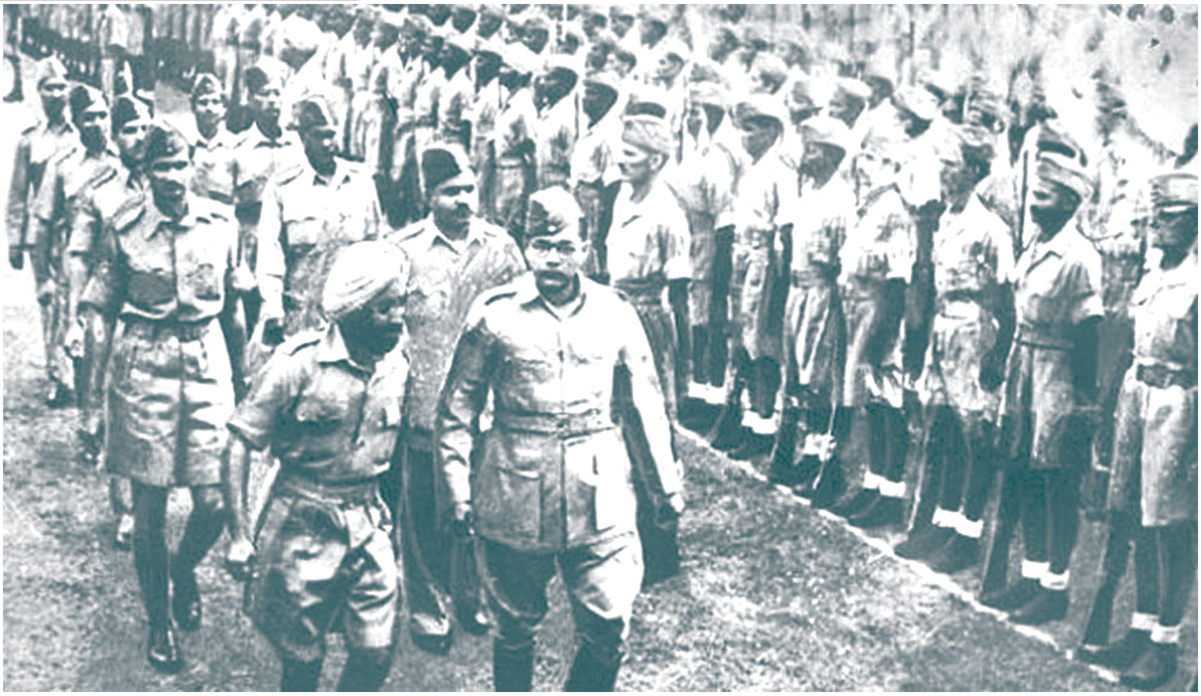

ভারতের স্বাধীনতায় সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদান

প্রণব দত্ত মজুমদার

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। ছদ্মবেশে অসামান্য দক্ষতায় ১৯৪১ সালের ১২ থেকে ১৬ জানুয়ারির মধ্যে কোনো একটি সময়ে ঘটে তাঁর মহানিষ্ক্রমণ। তিনি চলে গিয়েছিলেন জার্মানির বার্লিনে।

জাপান, জার্মানি ও ইতালি ছিল অক্ষশক্তির শরিক; আর ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স ছিল মিত্রশক্তির শরিক। এই দু' পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। সুভাষ অক্ষশক্তির সহযোগিতা নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার কঠিন পথকেই বেছে নিয়েছিলেন।

১৯৪২ সালের ২৯ তিনি হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে ৫ মে তিনি ইতালির রোমে গিয়ে মুসোলিনির সঙ্গেও মিটিং করে এসেছিলেন। হিটলার তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ সাহায্য করার ব্যাপারে আগ্রহী হলেন না, তবে সুভাষ যদি পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেন তবে সব রকমের সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপ বাহিনী তখন ব্রিটিশ বাহিনীকে তছনছ করে দিচ্ছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল।

সুভাষচন্দ্র জাপানে আত্মগোপন করে থাকা মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। জাপানে থেকে রাসবিহারী বসু পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বসবাসকারী দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে তৈরি করেছিলেন— 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপবাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনীর প্রচুর ভারতীয় সৈনিক। রাসবিহারী বসু জাপান সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই সমস্ত ভারতীয় সৈনিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের নেতৃত্বে তৈরি করেন আজাদ হিন্দ বাহিনী। ১৯৪২ সালের জুন মাসে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ব্যাংককে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ-এর এক মহাসম্মেলন হয়। সেখান থেকে জাপান সরকারের সম্মতিতে সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ করা হয়— তিনি যেন পূর্ব এশিয়ায় এসে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি রাজি হলেন।

হিটলার কথা দিয়েছিলেন সুভাষকে সবরকমের সহযোগিতা করবেন। ঠিক হলো

ফঃ ৬

শত্রুদেশের নজর এড়িয়ে সুভাষকে একটি জার্মান সাবমেরিনে করে ইংলিশ চ্যানেল, আটলান্টিক মহাসাগর পার করিয়ে, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল হয়ে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল হয়ে মাদাগাস্কারের দক্ষিণে জাপানি এলাকায় এসে একটি জাপানি সাবমেরিনে তুলে দেওয়া হবে। পরিকল্পনা মতো সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কিয়েল বন্দর থেকে সহযোগী আবিদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে জার্মান সাবমেরিনে রওনা দিলেন। দু' মাসেরও বেশি সময় নানারকম বিপদ অতিক্রম করে ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৩ মাদাগাস্কারের দক্ষিণে জাপানি জলসীমানায় এসে পৌঁছলেন। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আবিদ হাসানকে সঙ্গে করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে একটি রবার বোটে করে জাপানি সাবমেরিনে গিয়ে উঠলেন নেতাজী এবং জাপানি বেশে পৌঁছলেন। ১৬ মে জাপানের সামরিক বিমানে টোকিয়ো যান তিনি। রাসবিহারী বসু এসে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সব বিষয়ে আলোচনা হয়।

১০ জুন জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে মিটিং করেন নেতাজী। ১৬ জুন, নেতাজী জাপান পার্লামেন্টে আমন্ত্রিত হন। জাপান সরকারের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী তোজো প্রকাশ্যে নেতাজীকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে সামরিক সাহায্য-সহ সবরকমের সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।

২৭ জুন রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সিঙ্গাপুর পৌঁছান নেতাজী। ৪ জুলাই, সিঙ্গাপুরের 'ক্যাথে' হলে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ-এর প্রায় দু' হাজার আমন্ত্রিত সদস্যের উপস্থিতিতে রাসবিহারী বসু প্রথমে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ-এর সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন; তারপর নেতাজীকে সেই পদে বরণ করে নেন। পরদিন ৫ জুলাই সিঙ্গাপুরের সমুদ্রতীরে টাউন হলের সামনে বিস্তীর্ণ ময়দানে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় তেরো হাজার সৈনিক ও অফিসারের সামনে নেতাজীকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

২১ অক্টোবর, ১৯৪৩ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ-এর প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতি ক্রমে সিদ্ধান্ত নিলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি Provisional Government তৈরি করা হবে এবং নেতাজী হবেন সেই সরকারের প্রধান। তৈরি হলো অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার। নেতাজী হলেন সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারও তিনিই নির্বাচিত হলেন। তিনি অন্যান্য যে সব দায়িত্ব পেয়েছিলেন তা হলো— Minister of War এবং Minister of Foreign Affairs. রাসবিহারী বসু হয়েছিলেন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা। জাপান, জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া, মালয়, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপিন্স, ক্রোয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, সিঙ্গাপুর ও মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ওই দেশগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাস; নেতাজীর ছবিসমেত ছাপা হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের কারেন্সি।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পরদিনই সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যুগ্ম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দু'দিন পরেই নেতাজী রানি ঝাঁসি বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। ১৯৪৩ সালের শেষ দিকেই উত্তর বার্মার চিন্দউইন নদীর দু'পাশে দু'পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিল। পশ্চিমে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য আর পূর্ব দিকে জাপানি ও আজাদ হিন্দ বাহিনী।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপবাহিনী ও আজাদ হিন্দ বাহিনী আরাকান অঞ্চলে কঠিন পার্বত্য পথে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ চালায়। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাপানি বাহিনী ও আজাদ হিন্দ বাহিনী যুগ্মভাবে ইম্ফলের দিকে তাঁদের দুঃসাহসিক ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ অভিযান আরম্ভ করে। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, ঝোপ জঙ্গল পায়ে হেঁটে আরাকান পর্বতমালার পাহাড়ি পথে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই করে তাদের হঁটিয়ে দিতে দিতে জাপ বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী ১৪ এপ্রিল নাগাদ ইম্ফলের মৈরাং পৌঁছে গিয়েছিল। এখানেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল সওকত আলি মালিক আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন। জাপান সরকার ঘোষণা করেছিলেন— ভারতের যে অংশ দখলে এসে যাবে তার অধিকার আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে যাবে। ইম্ফল আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে এসে গেল।

একইভাবে কোহিমার দিকেও জাপানি বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রথম দিকে দ্রুততার সঙ্গে সাফল্য পেয়েছিল। এমনকী নেতাজী ওখানকার Ruzazho গ্রামে (এখনকার Phek district, Nagaland) গিয়ে কয়েকদিন থেকে ওখানকার সামরিক কর্মকাণ্ডের তদারকি করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ইম্ফল ও কোহিমা আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে ছিল। জুনের শেষ থেকেই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে।

সেবার বর্ষা আগে এসে গিয়েছিল আর এদিকটায় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। আরম্ভ হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জল-কাদা মাখা দুর্গম পার্বত্য রাস্তায় খাদ্য, ওষুধ, সামরিক সরঞ্জাম ইত্যাদির সরবরাহ প্রায় বন্ধের মুখে। সৈন্যদের পরিখা জল কাদায় ভরে গেল। সৈন্যরা কলেরা, ডাইরিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি অসুখে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে লাগলেন। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপান বড়োসড়ো ধাক্কা খাওয়ায় ওদিকেই পুরো শক্তি লাগিয়েছিল এবং এদিকের রণাঙ্গনে বেশি নজর দিতে পারছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ ও আমেরিকার বাহিনী অধিকতর শক্তি নিয়ে এদিকে প্রতি আক্রমণ শানিয়েছিল। বড়ো বিমানবহর নিয়ে অনবরত বোমাবর্ষণ করতে লাগলো, অবশেষে জাপানি সেনাধ্যক্ষ কাওয়াবে তাঁর সেনাবাহিনীকে পিছু হঠার নির্দেশ দেন এবং নেতাজীকে বিনয়ের সঙ্গে বুঝিয়ে বলেন কেন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু নেতাজী বলেন— স্বাধীনতার সৈনিকরা কখনো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যেতে পারে না। কাজেই হারবে জেনেও আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধ জারি রেখেছিল;

এমনকী ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে মাউন্ট পোপাতে প্রতিকূল অবস্থাতেও ভীষণ সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁরা। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে মিত্রবাহিনী, আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনা নায়ক— প্রেম কুমার সেহগল, শাহনওয়াজ খান ও গুরুবক্স সিংহ ধিলোঁ-কে গ্রেপ্তার করে নেয়। অবশেষে, পরিস্থিতি বিচার করে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধ বিরতি করে ফিরে আসার হুকুম দেন।

১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটমবোমা ফেলে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবারও অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করেন নেতাজী। তার আগে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিটিং করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। রানি ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা যাতে নিরাপদে নিজ নিজ স্থানে চলে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বেতনভুক কর্মচারীদের ছ'মাসের মতো কাজ চালাবার মতো টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে দেন।

ঠিক হলো একটি জাপানি বোমারু বিমানে সাইগন থেকে তাইপে হয়ে মাঞ্চুরিয়ার একটি জায়গায় নামবেন তিনি, সেখান থেকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় চলে যাবেন। সেইমতো যাত্রা করলেন; কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে যে খবর পৌঁছয় তা হলো— ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫ ওই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। অনেকের ধারণা, মিত্রশক্তিকে বিভ্রান্ত করার এবং এটি নেতাজীর আত্মগোপনের একটি চাল ছিল। ওই বিমান দুর্ঘটনায় যে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে তা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে আজও গবেষণা চলছে।

আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে সেনাদের এনে ভারতের বিভিন্ন সেনা ক্যাম্পে যুদ্ধবন্দি করে রাখা হয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে তিন

সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচরের অভিঘাতে যে সেনা বিদ্রোহ হয়েছিল তার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেটাই তাঁদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার কারণ বলে স্বীকার করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার অ্যাটলি।

সেনানায়ক--- শাহনওয়াজ খান, প্রেম সেহগল ও গুরুবক্স সিংহ ধিলোঁকে দিল্লির লালকেল্লায় এনে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে বিচার আরম্ভ হয়। ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যাতে ভারতীয়রা ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে আর লড়াই করার সাহস না দেখায়; কিন্তু লালকেল্লায় তাঁদের বিচার আরম্ভ হতেই, নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক লড়াইয়ের কাহিনি, তাঁদের আত্মত্যাগের কথা দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। দিকে দিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল। জনতা মারমুখী হয়ে উঠলো। দিকে দিকে আওয়াজ উঠলো— 'আজাদ হিন্দ ফৌজ কো ছোড় দো, লাল কিল্লা তোড় দো'।

সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈনিকদের উপর। দেশের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের আত্মত্যাগ, তাঁদের কঠিন লড়াইয়ের কাহিনি শুনে তাঁদের মধ্যে স্বাভিমান ও দেশভক্তির জোয়ার এসে গেল যেন। আত্মসম্মান বিকিয়ে তাঁরা আর ব্রিটিশের অধীনে কাজ করতে চাইলেন না। দিকে দিকে সেনা শিবিরে তাঁরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে দিলেন। ১৯৪৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল Royal Indian Navy-তে। ২০টি বিভিন্ন বন্দরে ৭৮টি জাহাজের প্রায় ২০ হাজার ভারতীয় নৌসেনা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। তাঁরা জাহাজের মাস্তুল থেকে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক টেনে নামিয়ে ভারতের তিরঙ্গা পতাকা উড়িয়ে দিলেন। নৌবাহিনীর এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগলো Royal Indian Airforce-এ অর্থাৎ ইংরেজের বিমান বাহিনীর গায়ে। সেখানেও ভারতীয় সেনারা ইংরেজ অফিসারদের গালমন্দ, অপমান সহ্য করে তাদের হুকুম তামিল করতে রাজি হলেন না— বিদ্রোহ আরম্ভ করে দিলেন। ক্রমে তা স্থলবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

সেনা বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় জনগণের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, হরতাল ইত্যাদি শুরু হয়ে গেল। অনেক জায়গাতেই জনতা মারমুখী হয়ে ইংরেজ দেখলেই তেড়ে যেতে লাগলো। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচারের অভিঘাতে দেশজুড়ে যেন দ্বিতীয় এক মহাবিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল— যা দমন করার ক্ষমতা তখন ইংরেজ প্রশাসকের ছিল না। আগে তারা ভারতীয়দের আন্দোলন, বিদ্রোহ ঠেকিয়েছে ইংরেজ অনুগত ভারতীয় সিপাহিদের কাজে লাগিয়েই, কিন্তু এখন তারাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে দিলেন।

চারদিক থেকে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নররা জরুরি বার্তা পাঠাতে আরম্ভ করলেন— পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে ইংরেজ নাগরিকদের নিরাপত্তা খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইংরেজ সরকার তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এমন ব্যবস্থা করতে লাগলেন যে পরিস্থিতি যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তাঁরা যাতে বিমান অথবা জাহাজে করে দ্রুত ভারত ছেড়ে পালাতে

পারেন। সেই পরিকল্পনা মতো ইংরেজ নারী, পুরুষ, শিশুদের বিমানবন্দর ও নৌবন্দরের কাছাকাছি রাখার ব্যবস্থা করা হলো। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছিল— Operation Gondola. এর থেকেই বোঝা যায়, বিশ্বযুদ্ধজয়ী ইংরেজ সরকারের কী করুণ অবস্থা হয়েছিল তখন। সেই সময় ভারতে দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সৈনিকের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ আর ইংরেজ সেনার সংখ্যা মাত্র চল্লিশ হাজার। ইংরেজ প্রশাসকরা হিসেব করে দেখলেন, এই অবস্থায় এত বড়ো দেশকে সামলাতে গেলে অন্তত পাঁচ ডিভিশন ব্রিটিশ সেনা লাগবে— যা মোতায়ন করা বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তীব্র আর্থিক সংকটে পড়া ব্রিটেনের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসকরা উপলব্ধি করলেন--- এতদিন যাদের সাহায্যে এতবড়ো দেশের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতেন সেই ভারতীয় সিপাইসান্ত্রীদেরই আনুগত্যেই যখন ফাটল ধরে গেছে, তখন মানসম্মান নিয়ে আর এদেশে থাকা যাবে না। ১৯৪৬ সালের ২৩ অক্টোবর ভাইসরয় Wavell অত্যন্ত জোরালো ভাষায় Secretary of State, Lord Pethick Lawrence-কে লিখলেন, যে ভাবে অবস্থার অবনতি হচ্ছে, তাতে ভারতে অবস্থানরত ইউরোপিয়ানদের নিরাপত্তার স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারকে অনতিবিলম্বে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরও লিখলেন--- 'আমার এই পরামর্শ দেখে 'হিজ ম্যাজেসটিস গভর্নমেন্ট' যদি মনে করেন যে আমার বিচার বুদ্ধির অভাব হয়েছে বা আমার নার্ভ ফেল করে গেছে তবে আমাকে পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন।' এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, যারা এতদিন গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে ভয় পায়নি, তারা এখন নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভয়ে ভারত ছেড়ে পালাতে চাইছে।

অবশেষে ঠিক হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশ ছেড়ে চলে যাবে ব্রিটিশ সরকার। ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়টি সুসম্পন্ন করার জন্য বড়োলাট ওয়াভেলকে বদল করে অত্যন্ত ডাকাবুকো দাপুটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৌবাহিনীর প্রধান এবং ব্রিটিশ রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ মাউন্ট ব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠানো হয় ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। মাউন্টব্যাটন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেশকে বিভাজিত করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানদের এবং ১৫ আগস্ট ভারতের নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন।

যেহেতু স্বাধীনতার পরে শাসনক্ষমতা গান্ধীবাদীদের হাতেই এসে গিয়েছিল, তাই ইতিহাস তাঁরা সে ভাবেই প্রস্তুত করলেন যেন গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ভয়েই বিশ্বযুদ্ধজয়ী ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাঁরা প্রচার করল— 'দে দী হমেঁ আজাদি বিনা খড়্গ বিনা ঢাল, সাবরমতীকা সন্ত তুনে কর দিয়া কামাল।' কিন্তু সত্যি কি তাই? বর্তমান গবেষকদের মতে— আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচারের অভিঘাতে দেশজুড়ে যে মহাবিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের বিদ্রোহের ফলেই বিশ্বযুদ্ধ জয়ী ইংরেজ ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বই--- Three Phases of India's Struggle for Freedom-তে সেই কথাই তিনি লিখেছেন— 'In particular the revelation made by INA trial and the reaction it produced in India— made it quite plain to the British, already exhausted by the war, that they could no longer depend upon the loyalty of the sepoys for maintaining their authority in India. This had probably the greatest influence upon their final decision to quit India.' ভারতীয় সংবিধান সভার সভাপতি বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর, ১৯৫৫ সালে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই একই কথা বলেছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার সময়কালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিস্টার ক্লিমেন্ট অ্যাটলি। তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন এবং রাজভবনে ছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তী কথায় কথায় কৌতূহলবশত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁকে। সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানায়কদের বিচরের অভিঘাতে যে সেনা বিদ্রোহ হয়েছিল তার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেটাই তাঁদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার কারণ বলে স্বীকার করেন মিস্টার অ্যাটলি। ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে গান্ধীজীর ভূমিকা কী ছিল তা জানার কৌতূহলও প্রকাশ করেছিলেন জাস্টিস চক্রবর্তী। মিস্টার অ্যাটলি বক্রোক্তি করে বলেছিলে— M-I-N-I-M-A-L, অর্থাৎ খুবই নগণ্য।

তথ্যসূত্র:

১. A Beacon Across Asia--- S.K.Bose, A Werth, S.A.Ayer.

২. Bose An Indian Samurai— Maj Gen. (Dr.) G.D. Bakshi, VSM (Retd).

৩. Bose or Gandhi Who Got India Her Freedom--- Maj Gen. (Dr.) G.D Bakshi, VSM (Reld).

৪. Revolutionaries— Sanjeev Sanyal.

৫. Satyameva Jayate— Abhijit Joag.

৬. স্বাধীনতার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ— শিশির কুমার বসু।

With Best Compliments from-

A Well Wisher

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেস—বীর সাভারকর

সায়ন্তন বসু

সুভাষচন্দ্র বসু মাত্র ২২ বছর বয়সে আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার উচ্চশিক্ষা, বংশপরিচয়, নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা, তাকে কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের নজরে আসতে সাহায্য করে। গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। সেইসময় বঙ্গের রাজনীতিতে এক শূন্যতা ছিল। তরুণ সুভাষ খুব দ্রুততার সঙ্গে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে লাগলেন। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে আরও শক্তিশালী করল। অবশ্য বিশের দশকে সুভাষের গ্রেপ্তার এবং তাঁকে বার্মার মান্দালয় জেলে পাঠানো, এই ঘটনা তাঁর জনপ্রিয়তাকে গগনচুম্বী করে। যদিও এই সময় থেকে তাঁর কার্যকলাপ কংগ্রেসের বিশেষ করে গান্ধীজীর অপছন্দ হতে শুরু হয়।

সুভাষচন্দ্র অনেক কংগ্রেসি নেতাদের মতো ইংরেজদের সঙ্গে আপোশপন্থী ছিলেন না। মনে রাখতে হবে যে ১৯২৯ সাল অবধি কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ চায়নি। এতদিন তারা শুধু ভারতীয়দের হাতে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা চেয়েছে। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্রথমবার পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ হয়। তাঁর আগে কংগ্রেসের অনেক নেতা ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করলেও দল হিসেবে কংগ্রেস এই অধিবেশনেই প্রথমবার এই দাবি প্রস্তুত করে। যদিও বঙ্গের বিপ্লবীরা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সম্পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে কথা বলেছে, এমনকী বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় এবং বিপিনচন্দ্র পালও বহু বছর আগে থেকেই এই দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু এই দাবির পক্ষে এক নতুন ও ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি করতে সমর্থ হলেন।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন প্রতিভাত হয়। তবে এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কিশোর সুভাষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। সুভাষের যখন ১৫ বছর বয়স তখন তিনি স্বামীজীর লেখা 'তরুণের স্বপ্ন' পাঠ করে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে জীবনে প্রথমবার নিজেকে দেশের কাজে নিয়োজিত করেন। সুভাষ বাল্যকাল থেকেই হিন্দু সমাজের রীতিনীতি নিষ্ঠাভরে পালন করতেন, এই সাধনা তিনি চিরকাল মেনে চলতেন। বাল্যকাল থেকেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর শিক্ষা তাঁর প্রেরণা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সামরিক পোশাকের বুকপকেটে ভগবতগীতা ও মা কালীর একটি ছবি সবসময়ই রাখতেন। ধ্যান তাঁর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন কাজ ছিল।

সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে রাজনৈতিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ। রাজনৈতিক সমাধান অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে সক্ষম হবে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি মনে করতেন, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, বেকারত্ব ও রোগব্যাধি এই চারটি সমস্যা হলো মূল সমস্যা। এই চারটি সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন। তিনি সেইকালে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা ভেবেছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মহিলাদের দুঃখের মূল কারণ তাদের

অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা। তিনি সবসময় চেয়েছেন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, পর্দাপ্রথার অবলুপ্তি। তিনি বিধবাবিবাহের কট্টর সমর্থক ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল সর্বপন্থসমভাব। তবে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ব্যাপক জনশিক্ষা মানুষের মধ্যে চেতনার প্রসার ঘটাতে সক্ষম। অশিক্ষা তথা নিরক্ষরতা দেশের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ বলে তিনি মনে করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও ব্যক্তির চরিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি মনে করতেন ব্যক্তি চরিত্রবান ও শিক্ষিত হলে বিকশিত হবে। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। ভবানী মন্দির পত্রিকাতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন 'রাষ্ট্র কী? মাতৃভূমি কাকে বলে? এটা একটা শিল্পের খণ্ড বা ভাষণের অংশ অথবা মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, এটা হলো এক বিশাল শক্তি যা সমস্ত শক্তির বিন্দু মিলিয়ে এক বিশাল পূর্ণতা পেয়েছে, যার থেকে আমাদের এই দেশ তৈরি হয়েছে।' সুভাষচন্দ্র এই দর্শনে বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষকে তিনি তাঁর গর্ভধারিণী মা বলে মনে করেছেন। এই দেশকে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিকতার মূলস্থানে বসিয়েছেন এবং একে এই বিশ্বের আত্মা হিসেবে বন্দনা করতেন। এই আধ্যাত্মিকতা তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ১৯৩৮ সালে হরিপুরাতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্যের বিষয় মনে করতে হবে। এই ভাষণে তিনি স্বাধীন ভারতের শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা বিশদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'সর্বপ্রথম আমাদের ভবিষ্যতের জাতীয় সরকারকে একটি সমিতি তৈরি করতে হবে যারা পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করবে।' দেশে যাতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় তাঁর পরিকল্পনা করার জন্য তিনি জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে এক সমিতি গঠন করেন। তিনি মনে করতেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য খুব প্রয়োজন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে পরাধীনতার জন্যই আমাদের এত বেকারত্ব, এত দারিদ্র্য এবং এত অনুন্নত জীবনযাত্রা। তিনি চাইতেন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতকে এক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে।

সুভাষচন্দ্র বসু তীব্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা পরম্পরার পক্ষে ছিলেন। তিনি প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মানুষের শক্তির উপর তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতো সাধারণ কৃষক, শ্রমিকদের বিপ্লবের উপর তিনিও পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। ২৩.৩.১৯২০-তে তিনি একটি চিঠিতে তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লিখলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে ভারতবর্ষের উন্নতি কেবলমাত্র দেশের কৃষক, শ্রমিক, মেথর, মুচি দ্বারাই সম্ভব হবে। এই কথাগুলো খুব বাস্তব।' রাষ্ট্রীয়তার প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র ছিলেন অনন্য। এই ক্ষেত্রে দুজনের প্রভাব ছিল অসীম। একজন স্বামী বিবেকানন্দ, অপরজন ঋষি অরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের মতো সুভাষও আইসিএস-এর চাকরি ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। বঙ্গের বিপ্লবীরা যেমন অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা পেয়েছিলেন এই দুই মহাপুরুষের থেকে, নেতাজীও তাঁর জাতীয়বোধ ও বিপ্লবের পাঠ নিয়েছেন এদের থেকেই।

নেতাজী চিরকাল গান্ধীজীকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু অচিরেই আন্দাজ করতে পারছিলেন যে, গান্ধীজীর পথ আর তাঁর পথ ভিন্ন হতে চলেছে। সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন, সেখানে গান্ধীজীর পথ ছিল নির্দিষ্ট, অহিংসা তথা সত্যাগ্রহ। দু'জনের সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটে যখন ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হতে চান। গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীজীর মনোনীতি প্রার্থী পট্টভী সীতারামাইয়াকে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত করেন। তখনকার দিনে গান্ধীজীর প্রার্থীকে হারিয়ে কংগ্রেস সভাপতি হওয়া ছিল এক অকল্পনীয় বিষয়। তাই গান্ধীজী বলেছিলেন, 'সীতারামাইয়ার হার আমার নিজের হার'। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষের সর্বজনবিদিত যে বিরোধ তা শুধুমাত্র সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই নয়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, স্বাধীন দেশের গঠন এবং অবশ্যই ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পথ নিয়ে ছিল। সুভাষচন্দ্র সবসময়ই ব্রিটিশ বিতাড়নের জন্য সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম তাঁর অন্যতম পথ ছিল।

১৯৩৯ সালে কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্র নিষ্কাশিত হন। নিষ্কাশনের পরে তিনি তাঁর নিজের রাজনৈতিক জীবন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করছিলেন। ঠিক সেই সময়ের একটি ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটল। ২ জুলাই ১৯৪০ সালে, হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণকে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলনের জন্য সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন এবং তাঁকে বন্দি করে পাঠানো হলো প্রেসিডেন্সি জেলে। এই জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো সুভাষের অগ্রজপ্রতিম বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। জেলের মধ্যে দুই স্বাধীনতা সংগ্রামীর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। সুভাষচন্দ্র খুব হতাশ ছিলেন এই সময়, তাঁর মনে হচ্ছিল যে পুরো দেশটাই একটা জেলখানাতে পর্যবসিত হয়েছে। জেলে হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁকে পরামর্শ দেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে এবং বাইরে থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে।

ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের থেকে বহিষ্কারের পরে মুম্বাইতে গিয়ে গান্ধীজী, মুসলিম লিগ নেতা জিন্না এবং হিন্দু মহাসভা নেতা স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেন। এই সময়েই তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করার জন্য নাগপুর যান কিন্তু ডাক্তারজী অসুস্থ থাকাতে সেই সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ব্যর্থ হয়। এতগুলো সাক্ষাতের মধ্যে বীর সাভারকরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাত্যন্ত্রবীর সাভারকরের ব্যক্তিগত সচিব শ্রীবাল সাভারকর একটি চিঠি লেখেন ১৯৫৪ সালের ২ জুন রাসবিহারী বসু স্মারক

সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ক্ষিতীশ চন্দ্র দাসের কাছে। তিনি সেই চিঠিতে এই সাক্ষাতের বিষয়ে জানান। 'ব্যক্তিগত বৈঠকটি ছিল নেতাজী সুভাষবচন্দ্র ও সাভারকরজীর মধ্যে সাভারকর সদন, মুম্বাইয়ে। সেখানে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা সাভারকরজী সুভাষবাবুকে জানান। তিনি বলেন যে উনি যাতে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবেন এবং জার্মানি যাওয়ার ঝুঁকি নেন। কারণ সেখানে যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দি আছে, তাদের সংগঠিত করে, জার্মানির সাহায্যে জাপান যাওয়া উচিত রাসবিহারী বসুর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য। নিজের যুক্তি সাজানোর জন্য সাভারকরজী সুভাষবাবুকে শ্রীবসুর একটি চিঠি দেখান, যা লেখা হয়েছিল জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক আগে।' ওই চিঠিটি রাসবিহারী পাঠিয়েছিলেন সাভারকরকে ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মাধ্যমে। সুভাষচন্দ্র ও সাভারকরের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২২ জুন, ১৯৪০ সালে। স্বয়ং সাভারকর এই তথ্য তাঁর ব্যক্তিগত সচিব বাল সাভারকরকে জানিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসবিহারী বসু হিন্দু মহাসভার জাপান শাখার সভাপতি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে রাসবিহারী বসুর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। রাসবিহারী সাভারকর সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সুভাষ ও সাভারকরের মধ্যে এই ঐতিহাসিক বৈঠকে সুভাষচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান একতার বিষয়ে সাভারকরের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। এই বৈঠকের আগে সুভাষচন্দ্র জিন্নার সঙ্গে একই বিষয়ে বৈঠক করেন কিন্তু সেই বৈঠক ব্যর্থ হয়। সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে জার্মানি বা ইতালির সাহায্যে ব্রহ্মদেশ অথবা বঙ্গোপসাগর দিয়ে ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ করার প্রস্তাব দেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে এভাবে আক্রমণ করে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এটা পরিষ্কার যে সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে ভারতের বাইরে যাওয়ার বিষয়ে এবং রাসবিহারী বসুর সঙ্গে হাত মেলানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন।

স্বাধীনতার আলোচনা করতে গেলে সর্বসময় মনে রাখতে হবে, বীর সাভারকর একমাত্র ভারতীয় যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ক্রমাগত তাঁর ভাষণ ও লেখার মাধ্যমে ভারতীয় যুবকদের দেশের ভিতরে ও বাইরে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহিত করেছিলেন যাতে তাঁরা যুদ্ধের আধুনিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এবং আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী শিখতে পারে। তাঁর এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তখন অনেক যুবক সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সাভারকরের আসল উদ্দেশ্য ছিল সময়মতো এই ভারতীয় সৈন্যদের মাধ্যমে সারাদেশে আরও একটা লড়াই সংগঠিত করা ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের অনুকরণে। অবশ্য এই ধরনের অনুরূপ পরিকল্পনা এর আগে রাসবিহারী বসু করেছিলেন ১৯১৩-১৪ সাল নাগাদ। সুভাষচন্দ্র বসু পরবর্তী সময়ে সাভারকরের এই মতামতের বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। ১৯৪৪-এর ২৫ জুলাই যখন তিনি নেতাজী, তখন তিনি ঘোষণা করলেন, 'ভ্রান্তিতে ভরা রাজনৈতিক চিন্তা এবং দূরদৃষ্টির অভাবে কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ ভারতীয় সেনার সমস্ত সৈন্যকেই হানাদার বলে অভিহিত করেছেন। এটা জানা অত্যন্ত জরুরি যে বীর সাভারকর নির্ভয়ে ভারতীয় যুবকদের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলছেন। সেনাবাহিনীতে যুক্ত এই যুবকেরাই আমাদের প্রশিক্ষিত সৈনিক জোগান দেবেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির জন্য।' নেতাজী সাভারকর সম্পর্কে এই মহান দৃষ্টিকোণ রাখতেন। যে সময় সুভাষচন্দ্র সাভারকরের সঙ্গে আলোচনা করছেন, প্রায় একই সময়ে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আসার আহ্বান জানান। এমনকী সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, তখন রাসবিহারী বঙ্গের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখেন, যাতে তিনি লেখেন একজন যোগ্য নেতাকে জাপানে পাঠানোর জন্য, সেই নেতা সুভাষচন্দ্র বসু হলে খুব ভালো হয়, সেই উল্লেখও করেন। চিঠিটি জাপান থেকে নিয়ে এসেছিলেন বালিগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জে সি দাস। রাসবিহারী সেই চিঠিতে লেখেন, 'হয় এবার নয় নেভার'। এই চিঠিটি স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিকুমার চক্রবর্তীর মাধ্যমে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছায়।

> “সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে জার্মানি বা ইতালির সাহায্যে ব্রহ্মদেশ অথবা বঙ্গোপসাগর দিয়ে ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণ করার প্রস্তাব দেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে এভাবে আক্রমণ করে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা সম্ভব।”

নেতাজী প্রথম থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। সে কারণেই তিনি মোতিলাল নেহরুর দ্বারা প্রস্তাবিত ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। সেই থেকে নেতাজী নিজের মতামত খুব স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পরেও তিনি তাঁর বক্তব্যে ছিলেন অবিচল। তিনি প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন সাভারকরের সেই প্রস্তাব, যে প্রস্তাবে সাভারকর ভারতীয় যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে বলেছেন। জাতীয় নেতৃত্বের একটি বড়ো অংশ যদিও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিল। সাভারকরের প্রস্তাব মেনে এবং রাসবিহারী বসুর দেখানো পথেই দেশের বাইরে যান সুভাষচন্দ্র। তাঁর কলকাতা থেকে আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়ার মধ্য দিয়ে জার্মানি এবং সেখান থেকে জাপান যাত্রা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে দুঃসাহসিক রাজনৈতিক অভিযান। সেই অভিযানের আলোকপাত অবশ্যই করা দরকার। □

খো খো বিশ্বকাপ ২০২৫ ভারতের জার্সিতে সুমন বর্মন

নিলয় সামন্ত

হুগলী-চুঁচুড়া মিলন পল্লীর বাসিন্দা সুমন বর্মন ছোটো থেকেই খো খো মাঠে কঠোর পরিশ্রম করছে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও চলেছে অনুশীলন। তবুও স্বপ্ন দেখা ছাড়েননি সুমন। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতে হতে চলেছে প্রথম খো খো বিশ্বকাপ। সেখানেই ভারতীয় দলে এবছর ডাক পেয়েছেন চুঁচুড়ার সুমন।

ছোটো থেকেই খেলার প্রতি বিশাল নেশা সুমনের। বাবা রিক্সা চালক, মা রান্নার কাজ করেন। সেই পরিবারের ছেলে সুমন এবার দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পাড়ি দিচ্ছেন দিল্লি। ২০২৫ সালে ১৩ থেকে ১৯ জানুয়ারি দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে বসবে প্রথম খো খো বিশ্বকাপের আসর। শুধু এশিয়া নয়, সারা বিশ্বের ২৬টি দেশ অংশ নেবে এই প্রতিযোগিতায়। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যান্ডেল হরনাথ স্কুল থেকে পাশ করে বর্তমানে সে এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হাট গোবিন্দপুর কলেজের প্রথম বছরের ছাত্র।

ভারতীয় দলের জার্সিতে রেস্ট অব ইন্ডিয়া দলে ইতিমধ্যেই খেলে ফেলেছেন সুমন। এছাড়াও আলটিমেট খো খো দলে চেন্নাইয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ব্যান্ডেল হরনাথ স্কুলের মাটি থেকেই আমার যাত্রা শুরু। জুনিয়র ন্যাশনাল, ন্যাশনাল গেমস, খেলো ইন্ডিয়াতেও এসেছে সাফল্য। তৃতীয় স্থান পেয়েছিলাম।' আলটিমেট খো খো প্রতিযোগিতায় তিনবার সেরা ধাবকের পুরস্কারও পেয়েছেন।

সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া নিয়ে সুমন বলেন, 'এক সময় স্কলারশিপ পেতাম কিন্তু এখন তা বন্ধ রয়েছে। আশা করছি বিশ্বকাপের পর আবার শুরু হবে স্কলারশিপ। তবে খো খো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া এবং খেলো ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে পেতাম। কিন্তু এই বছরে মার্চ মাস থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়। আশা করছি ওয়ার্ল্ড কাপের পর আবার শুরু হবে।'

সুমনের লক্ষ্য এখন বিশ্বকাপ জয় করার। ন্যাশনাল গেমস এবং ২০৩৬ সালে খো খো অলিম্পিকে দেশের জার্সিতে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাছাড়া, মা ও বাবা বরাবরই উৎসাহ দিয়েছেন খেলা চালিয়ে নিয়ে যেতে, তাও জানিয়েছেন। হরনাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কোচ কৃষ্ণরঞ্জন চক্রবর্তী এবং অন্য প্রশিক্ষকরা বলেন, 'সাব জুনিয়ার, জুনিয়ার, সিনিয়ার, ন্যাশনাল গেমস, আলটিমেট খো খো লিগ, খেলো ইন্ডিয়ায় ডাক আসে সুমনের। ১৩ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি বিশ্বকাপের জন্য দিল্লিতে এক মাসের ক্যাম্প হবে। আমরা আশাবাদী ওর চূড়ান্ত দলে খেলা নিয়ে। বিশ্বকাপ খেলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। সকালের প্র্যাকটিস করে রঙের কাজে যেত সুমন, কাজ শেষ করে আবার বিকেলে এসে কঠোর পরিশ্রম করত খেলার মাঠে। আমরা আশা করছি ভারত সোনা জিতলে তাতে অবদান রাখবে সুমন।